বিগত যুদ্ধের বাজারে রংয়ের কারবার ক'রে যাঁরা অবস্থা ফিরিয়েছেন সুকুমার সেন তাঁদের অন্যতম। তিনি হাল আমলের ধনাঢ্য ব্যক্তি। পুত্রসন্তান নেই। দুইটিমাত্র কন্যা, একবৃন্তে দুটি ফুল— অণিমা আর ললিতা।

মেয়েমহলে অণিমার নাম কম নয়। স্ত্রীলোকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে কি বস্তু এ যারা অণিমাকে দেখেনি তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। কলেজে তার জুড়ি নেই। ভালো প্রবন্ধ রচনায় খ্যাতি তার অসামান্য, চিন্তাধারা তার নতুন, ষ্টাইলে সে যথেষ্ট অগ্রগামিনী। মেয়ের মধ্যে মেয়ে অণিমা।

সুকুমার সেনের মেয়ে সুতরাং তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। বিবাহ সম্বন্ধে সে উদাসীন, উদ্বেগও নেই আয়োজনও চোখে পড়ে না। এই অণিমা দেবী একদা প্রস্তাব এনে বসলেন, মেয়েদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র গ'ড়ে তোলা হোক্। মেয়েদের সাধারণ অশিক্ষা, চরিত্রগত দৌর্ব্বল্য, আর্থিক অধীনতা ইত্যাদির সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক গবেষণা শোনে নি এমন মেয়েই ছিল না। শিক্ষার আলো বিকীরণ ক'রে এই বহুযুগের অন্ধকার বিদূরিত করতে হবে। পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটা কিছু নয়।

উদ্যোগপর্ব্বে যে মেয়েটির সাহায্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়াল তার নাম মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী অণিমার বাল্যবন্ধু। বাল্যবন্ধুত্বের অর্থটা সুস্পষ্ট। স্কুল থেকে সমানে দুজনে কলেজে

উঠে এসেছে। সুখ দুঃখের সঙ্গী মৈত্রেয়ী, [illegible]মার মনের খবর সে জানে, সে জানে তার হৃদয়ে প্রবেশ করার পথ। একই গাড়ীতে তারা যায় কলেজে, পালাপার্ব্বণে একত্র বিদেশে যায় হাওয়া বদলাতে। বাতাসের সঙ্গে যেমন সূর্য্যকিরণের সম্পর্ক, নদীর সঙ্গে যেমন তরঙ্গের, ফুলের সঙ্গে [illegible] গন্ধের—তেমনি সখীত্ব ছিল অচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গী। অণিমার চা[illegible] ছিল শ্রী, মৈত্রেয়ীর—মাধুর্য্য। তাদের নিয়ে স্কুলে হোতো কোলাহল, কলেজে হয় কানাকানি।

বাগানবাড়ীর বড় হল্‌টায় একদিন জনকয়েক মেয়েকে নিয়ে সভা বসলো, প্রস্তাব পাস হয়ে গেল, কমিটি তৈরি হোলো। প্রস্তাব আনলে মৈত্রেয়ী। বলা হোলো, এই শিক্ষাকেন্দ্রের অর্থ বিদ্যালয় নয়, পাঠাগার। আপনাদের সকলের সমবেত সাহায্যে এর প্রতিষ্ঠা, এর রক্ষণাবেক্ষণে ও উন্নতির জন্য আমরা যেন বাইরের সাহায্য গ্রহণ না করি। দেশের সমগ্র নারীসমাজকে সর্ব্বাংশে উন্নত করতে গেলে এরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্রের অশেষ প্রয়োজন। আমাদের উৎসাহ ও পরিশ্রম যদি আন্তরিক হয় তবে জয়ের আশা সুদূরপরাহত নয়।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সবাই করতালি দিয়ে মৈত্রেয়ীর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তারপর এলো অণিমার পালা। উঠে দাঁড়াতেই করতালি ও হর্ষধ্বনি। মাথার উপরে পাথার হাওয়ায় উড়ছে

তার চুল, গৌরবগর্ব্বিত দুটি চক্ষু। ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে আপন বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করতে লাগল। কথা বলে সে কম কিন্তু তার সেই স্বল্পভাষণটুকু আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধিমত্তায় উজ্জ্বল এবং সুন্দর। তারপর একে একে সবাই বললেন। প্রতিভা দেবী বললেন, বিজয়া সিংহ বললেন, বললেন তিলোত্তমা ঘোষ। তারপর সভানেত্রীর অভিভাষণ, পরিশেষে সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দান।

অতঃপর সভাভঙ্গ।

পাঠাগারের নাম রাখা হোলো 'তরুণী-সঙ্ঘ।' অদম্য উৎসাহভরে ওর কাজ চলছে। সভ্যসংখ্যা বেড়েই চলেছে দিন দিন। চাঁদা ওঠে নিয়মিত। চাঁদার খাতার আয় দেখলেই বুঝতে পারা যায় তরুণী-সঙ্ঘের অকালমৃত্যু ঘটবেনা সহজে। মেয়েরা শ্রদ্ধা করেছেন এই প্রতিষ্ঠানকে, সম্মান করেছেন অণিমা আর মৈত্রেয়ীর চরিত্রনিষ্ঠাকে। এই দুটি মেয়ের ক্রিয়াকলাপ সংবাদপত্রে বড় বড় হরপে ছাপা হয়েছে।

প্রথম নম্বর চাঁদা আদায়ের ভার পড়েছে শিবানীর ওপর। মেয়েদের প্রথম দাবি অন্দরমহলে। সেদিন হাতে একটা সেলাই নিয়ে শিবানী তার দিদি আর জামাইবাবুর আশে পাশে গুন গুন করে ফিরছিল। এমন সময় বাড়ীতে একজন অতিথির আগমনের আভাস পাওয়া গেল।

তরুণী-সঙ্ঘ

সদর দরজায় গাড়ী এসে দাঁড়াতেই একটা কলরোল উঠ্‌ল। ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো, তাদের পিছনে পিছনে আর সবাই। আজ দশ বছর পরে তাদের ছোটকাকা ফিরলেন বিলেত থেকে। শিবানীও জান্‌ত তার দিদির দেবর শীঘ্রই আসছেন, আবালবৃদ্ধবণিতা রয়েছে তাঁর প্রতীক্ষায়। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যক্তিটিকে নিয়ে এ বাড়ীতে নানা গল্প ও আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও মনোমালিন্য। আগন্তুক সকলের নিকটেই কিছু রহস্যময়।

আড়াল থেকে দেখা গেল মোটর থেকে একজন বয়স্ক যুবক লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। বলিষ্ঠ, সুরূপ ও হাস্যমুখ। মাথার চুলগুলো ঘন রেশমের মতো—অগোছাল, উচ্ছৃঙ্খল; চোখ দুটো অস্থির, অস্থির হ'লেও সুদৃশ্য। চঞ্চল ভঙ্গীতে কোথাও জড়তা নেই, কোথাও নেই সঙ্কোচ। থাকবার কথাও নয়। যেমন দ্রুত তেমনি চকিত। নিমেষমাত্র তাকে দেখেই শিবানীর যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল। ছুটে পালাল ভিতরে।

আগন্তুকের নাম ভবেশ। বৌদিদি বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ভবেশ তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল। পায়ের ধূলা নেওয়াটা তার অভ্যাস থেকে স'রে গেছে, তাঁর হাত ধ'রে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে ভবেশ বললে, বাপরে, বাপ, তুমি ভয়ানক ভারিক্কে হয়ে গেছ দেখছি। চিঠি পেয়েছিলে ত বৌদি?

বৌদিদি বললেন, জিনিসপত্তর কই গো? কোথায় এসে উঠেছ?

উঠেছি একটা হোটেলে। আর একটু আগেই আসতুম বৌদি, ভারি ব্যস্ত ক'রে রেখেছে ওরা। কেবল ছুটোছুটি। কেমন আছ বলো। এরা তোমার ছেলেপুলে ত? এই বাব্বু, তোর নাম কি রে?

ছোট একটা ছেলেকে ছোঁ দিয়ে ভবেশ কাঁধে তুলে নিলে।

বৌদিদি বললেন, চেনাই যায় না ভাই তোমাকে। একেবারে সায়েব বনে গেছ। কী ছেলে বাবা, একটুও মায়াদয়া নেই। সেই কুড়ি বছর বয়সে বিনা টিকিটে জাহাজে পালিয়েছিলেন, আর আজ এই দেখা! খানা খাও ত?

ভবেশ হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

তারপর দুঃসাহসের গল্প সুরু হোলো। সবাই এসে বৈঠক বসালেন ভিতর মহলে। ছোটরা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনতে লাগল গল্প। জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে পালানো, বন্য বরাহের সঙ্গে লড়াই, দস্যু দলের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা, অরণ্যে পথ হারানো—প্রকাণ্ড একখানা উপন্যাস। বৌদিদি বললেন, কী কঠিন ছেলে তুমি, কত রাত ভেবে ভেবে আমাদের ঘুম হয় নি।

ভবেশ বললে, বিপদ নিয়েই আমার আয়ু বৌদি। বুদ্ধি আর শক্তির পরীক্ষা চিরকাল। কথনো হার, কথনো জিৎ।

বাড়ীথানা প্লাবিত হতে লাগল আদরে অভ্যর্থনায় আর

উল্লাসে। পাশের ঘরে একান্তে শিবানী হাতের সেলাইটা রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

ভবেশ বললে, শাকের তরকারি রেঁধো বৌদি, আর মোচার ঘণ্ট, আর ডুমুর ভাজা, বুঝলে? পেটের মধ্যে আমার পশুপক্ষীর বাসা, এবার বসে বসে দিনকতক বনজঙ্গল খাই। ওঘরে কে ব'সে বৌদি?

বৌদিদি সেদিকে একবার ফিরে বললেন, ভুলে গেছ ওকে? ও যে আমার ছোট বোন। শিবানী।

দিদির দেবরের গল্প নিয়ে আত্মবিস্মৃত ছিল শিবানী। বিভ্রান্ত হয়ে শুনে চলেছিল তার ইতিবৃত্ত। এবার নিজের নামটা শুনে তার চমক ভাঙ্‌ল। বিব্রত হয়ে সে মাথা হেঁট ক'রে সেলাইটা তুলে নিলে। যেন সে কাজ নিয়েই ব্যস্ত, গল্পের দিকে মন দেবার সময় নেই তার। সে তরুণী-সঙ্ঘের মেয়ে।

কিন্তু দিদির ডাক শুনে তাকে বাইরে এসে দাঁড়াতে হোলো। ভবেশ মুখ তুলে তার প্রতি চেয়ে হেসে বললে, সেই এতটুকু মেয়ে দেখে গিয়েছিলুম, রোগা দুরন্ত মেয়ে। ডাক নাম খুকি, না বৌদি?

বৌদিদি বললেন, হ্যাঁ। দুরন্ত কি আর এখনই কম? আজকে ক্লাব, কালকে ফীষ্ট, পরশু একজিবিশন্, এই সবেই ত আছে। আজকাল শুনতে পাচ্ছি সুকুমার সেনের মেয়েদের সঙ্গে লাইব্রেরী চালানো হচ্ছে।

সেটা কি ব্যাপার ?

গলা পরিষ্কার ক'রে শিবানী বললে, তার নাম তরুণী-সঙ্ঘ। মেয়েদের প্রতিষ্ঠান ।

বৌদিদি হেসে বললেন, মেয়েদের স্বাধীন করার ওটা নাকি একটা যন্ত্র। ওঁরা বিয়ে করবেন না, অশিক্ষা দূর করবেন। উপার্জ্জনের পন্থা বাৎলানো হয় সেখানে।

ভবেশ বললে, তাহ'লে তুমিও বিয়ে করবেনা, কেমন খুকি !

শিবানী বললে, ও নামে আর ডাকবেন না।

হা হা ক'রে ভবেশ হেসে উঠল। বললে, তা বটে। ডাকা উচিতও নয়। ডাকতে গেলেও বাধবে।

শিবানী স্নিগ্ধ হেসে দিদির পাশে কুটনো কুটতে ব'সে গেল। তারপর বললে, আপনাকে কিন্তু আমাদের লাইব্রেরীর জন্যে চাঁদা দিতে হবে।

চাঁদা ? না দেখেই দেবো ?

বেশ, একদিন দেখিয়ে আনব। মোটা চাঁদা দেবেন ত ?

বলা কঠিন। সেটা নির্ভর করবে তোমাদের কৃতীত্বের ওপর। —এই ব'লে ভবেশ আর এক দফা হেসে নিলে। হাসিটা তার ভালো, বেশ একটা দুরন্ত প্রাচুর্য্যের আভাস পাওয়া যায়। এর নাম পুরুষ। পুরুষ দেখেনি শিবানী জীবনে।

বৌদিদি বললেন, মা ছিলেন, আজ তিন বছর হোলো তিনিও

নেই। মামার ওখানে শিবানী থাকতে চাইল না, আনলুম আমার এখানে। এখান থেকেই কলেজ যায়। মেয়ে ধরেছে, বিয়ে করবে না।

ভবেশ বললে, তাই নাকি ? বাঙালী মেয়ের মুখে নতুন কথা!

বৌদিদি বললেন, তা বললে কি আর হয় ভাই। স্বাধীন মেয়েরাই কি আর বিয়ে করে না ?

শিবানী লজ্জায় রাঙা হয়ে আলুর খোসা ছাড়াতে লাগল, কথা বললে না।

ভবেশ বললে, বেশ ত, আরো দু পাঁচ বছর পড়াশুনো করুক না বৌদি ?

তারপরে কি বিলিতি মতে বিয়ে হবে ?

মন্দ কি, নির্ব্বাচনের অধিকার নিজের হাতেই থাক্।—ব'লে ভবেশ আবার এমন ক'রে হাসল যে, শিবানীর পক্ষে আর ব'সে থাকা সম্ভব হোলো না। মুখখানা লুকিয়ে সে ছুটে পালাল অন্দরের দিকে।

তারপর আবার গল্প সুরু হোলো। কত রাজ্যের কথা, কত দুর্দ্দান্ত কাহিনী। আরব দেশের গল্প, বরফের দেশের ইতিহাস, স্বাধীন জাতির বিচিত্র বিবরণ, যুদ্ধের চিত্রকথা, মেয়েদের আন্দোলন। এ বাড়ীটার ভিতরে যেন একটা তীব্র আলোকরশ্মি এসে পড়েছে। পাশের ঘরে ব'সে শিবানীর চোখ দুটো নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে

এলো। তাদের সকলের আরাধ্য বিস্ময় ঐ ভবেশ। এর হাতে যেন সমগ্র পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতাটা বন্দী। লোকটা যেন দিগ্বিজয়ী।

বিকেল বেলার দিকে শিবানী ছুটতে ছু[illegible] মেসের বাড়ীতে এসে হাজির। রুদ্ধশ্বাসে সংবাদটা [illegible] দরকার। অণিমা আর মৈত্রেয়ী তখন আপিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আসন্ন সন্ধ্যার রাঙা আলো এক ঝলক এসে পড়ছে তাদের পিঠের দিকে।

শিবানী বললে, একজন নতুন ডোনর্ পাওয়া গেছে অণিমাদি।

অণিমা বললে, মেয়ে না পুরুষ।

না, মেয়ে নয়।

পুরুষ? কেমন? তোমার কে হন্?

আত্মীয়।

মৈত্রেয়ী এবার মুখ তুলে বললে, বয়স্ক ব্যক্তি?

শিবানী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে, বিলেত থেকে ফিরেছেন, এখনো বিয়ে করেন নি।

আই-সি-এস্ নাকি?

না।

অণিমা আর মৈত্রেয়ী দুজনেই চুপ। কিন্তু ফস ক'রে শিবানী এক সময় ব'লে বসল, লোকটি বেশ ভালো। অন্তত আমার তাই মনে হোলো।

অণিমা বললে, ভালো বলেই ভাবনা। যাই হোক, বিলেত-ফেরতা যখন, তখন নিশ্চয়ই সচ্চরিত্র। কত দেবে বল্ ত?

তা জানিনে ভাই। কিছু দিতে হবে তাই বলেছি।

এক টাকা দিয়ে ষোল আনা আদায় করবে না ত?—মৈত্রেয়ী হেসে বললে।

শিবানী বললে, তোমরা যদি সুবিধে দাও করবে বৈ কি।

অণিমা বললে, সুবিধে দিতে হয় না, ওরা নিজেরাই ক'রে নেয়। নদীর জলের মতন তটকে অলক্ষ্যে ক্ষইয়ে ফেলে, যখন জানা যায় তখন আর উপায় থাকে না। আত্মরক্ষা করার শক্তিকে দেয় ঘুণ ধরিয়ে। ওরা যে সোনার হরিণ। কিন্তু ডোনেশন্ যে দিতে চায় তাকে বিদ্রূপ করো না শিবানী, টাকা দিতে পারে পুরুষই।

মৈত্রেয়ী বললে, মেয়েরাও ত টাকা দেয় অণিমা।

মেয়েরা দেয় বিপদের দিনে, পুরুষরা দেয় গঠনের কাজে। স্থায়ীত্বের দাম বোঝে ওরা। ভদ্রলোকের নাম কি শিবানী?

শিবানী বললে, ভবেশ।

ও, তোর মুখেই ত শুনেছি তাঁর নাম।

এমন সময় ঘরের ভিতর মৃণাল এসে দাঁড়াল। কুমারী হলেও সে মাথায় ঘোমটা দেয়, ওটা নাকি ওর ব্যক্তিত্বকে গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত করে। টেব্‌লের ধারে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল, ঘোমটার ভিতরে তার এলো খোঁপাটা কাঁধের পাশে ভেঙে পড়েছে।

জামার ভিতর থেকে সে একটা মণিব্যাগ বা'র করলে। হাত ঢুকিয়ে টেনে আন্‌ল পাঁচটা টাকা। বললে, এটা জমা ক'রে নাও, বিজয়াদি পাঠালেন।

মৈত্রেয়ী বললে, তিনি যে এলেন না?

তাঁর কাকাবাবু এসেছেন, কথা কইতে ব্যস্ত।

আমাদের সেই মাষ্টারমশাই?

হ্যাঁ।

টাকাটা অণিমা জমা ক'রে নিলে। তারপর বললে, শ্রীমতী মৃণালিনীকে আজ এত চনমনে দেখাচ্ছে কেন?

মৃণাল হেসে বললে, সব কারণগুলো প্রকাশ্য নয়। কিন্তু আজকে আর দাঁড়াব না, কাজ রয়েছে বাইরে। শিবানী, আসবি নাকি?

শিবানী বললে, কোন্ দিকে যাবে তুমি?

মৈত্রেয়ী চট্ ক'রে বললে, মৃণাল আজকাল দিক্‌ভ্রান্ত।

কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত নই। ব'লে হেসে মৃণাল বেরিয়ে গেল।

*

* *

শীতের দিন। খোলা জানলার ভিতরে ও বাইরে ধীরে ধীরে অন্ধকার দল পাকিয়ে চলেছে। ঘরটা নিস্তব্ধ। আলোটা এখনো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি। টাইমপিস্ ঘড়িটায় টিক্‌টিক্ শব্দ হচ্ছে। খাটের উপরে বিজয়া, তার একান্তে কাকাবাবু। তিনি মাষ্টার-মশায় নামে পরিচিত। দুজনেই নিস্তব্ধ।

উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা কিছু নেই। গ্রাম সম্পর্কে কাকা ও ভাইঝি। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। সদালাপী, সুপুরুষ। বিবাহ করেন নি, করবেনও না। অবস্থা আগে ছিল ভালো, এখনো দিনকালের তুলনায় মন্দ নয়। গ্রামে বহু পরিবারের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত ছিলেন,সুশিক্ষিত ব'লে তাঁর সুনাম এখনো অক্ষুণ্ণ। লোকটি পরোপকারী। তারপর এলেন শহরে, কিন্তু ভুললেন না গ্রামের কথা। অর্থাৎ গ্রামের স্কুল, মন্দির, বারোয়ারি, লাইব্রেরী—এরা তাঁর অকৃপণ প্রসাদে এখনও বঞ্চিত হয় না।

গ্রামের মিত্র পরিবারের বড় মেয়ে এই বিজয়া। বিজয়ার নিত্য সংবাদ তিনি রাখেন।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙল। বিজয়া বললে, মৃণালকে আজ তাঁরা দেখে গেলেন। বুঝলেন কাকাবাবু, মৃণালকে আজ তাঁরা—

বেশ, বেশ। ব'লে মাষ্টারমশাই একটু নড়ে উঠলেন, বললেন, এবার একটা তারিখ ঠিক ক'রে ফেল মা, এই শীতেই—ঘটা করেই বিয়ে হোক, কি বলো মা?

আবার অনেকক্ষণ নীরবে কাটল। বিজয়া নেমে গিয়ে সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললে। বললে, কিন্তু মৃণালের বক্তব্যটা কি শুনেছেন কাকাবাবু?

তিনি মুখ তুলে চাইলেন।

বিজয়া বললে, তরুণী-সঙ্ঘের পাণ্ডা, বিয়ে করতে চায় না।

অর্থাৎ, যাকে বিয়ে করবে তাকে বাজিয়ে নেবে, এই ত? বেশ, আমিও তাই বলি। আসুক সেই বামুনের ঘরের গরুকে ধ'রে।

বিজয়া পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে সে একসময় বললে, আচ্ছা কাকাবাবু?

কি মা?

ধরুন, এ পাত্রকে বিয়ে করতে মৃণাল যদি সত্যিই রাজি না হয়?

কিন্তু পাত্র যে ভালো। এত বড় ডাক্তার, ভদ্র চরিত্র, সুপুরুষ—অবশ্য মৃণালকে আমি অল্পদিনই চিনি, জানিনে ঠিক কেমন পাত্রকে তার ভালো লাগবে। এর সঙ্গে যদি না হয়, অন্য পাত্রও আনতে পারব।

বিজয়া নতমস্তকে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু একেবারে চুপ

ক'রে থাকতেও আজ তার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মুখ তুলে আবার বললে, কাকাবাবু, আচ্ছা একটা কথা আপনি মানেন?

কি বলো ত?

লোকে ছেলের দিকটাই দেখে, দেখে না মেয়ের দিকটা মৃণালের মতামত শুনলে আপনি রাগ করবেন ত কাকাবাবু?

রাগ করব?—মাষ্টারমশায় হেসে বললেন, তুমি চিনলে না আমাকে। মেয়েদের মতামতের স্বাতন্ত্র্য যদি থাকে আমি খুসি হয়ে শুনি।

বিজয়া স্মিতমুখে বললে, আমি জানি এ-পাত্রকে বিয়ে করা মৃণালের মত নয়।

পাত্র কি তার অযোগ্য?

অযোগ্য নয় একথা মৃণাল বেশ জানে। কিন্তু কাকাবাবু, কোনো পাত্রকেই মৃণাল বোধ করি বিয়ে করতে চাইবে না।

বিয়ে ত করবে সে?

বিজয়া খানিকক্ষণ নীরবে রইল, তারপর এক সময় মুখ তুলে বললে, হ্যাঁ, বিয়েতে তার অমত নেই।

মাষ্টারমশায় হেসে বললেন, আমার বয়েসটা এত দূরে এসে পড়েছে যে পেছন দিকে দূরে আর কিছুই দেখতে পাইনে, ঝাপসা দৃষ্টি, সহজ কথাটা সোজা ক'রে বুঝতে পারাটা—আচ্ছা দেখি মা, একটু ভেবে দেখি আজকের মতন।

সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে মাষ্টারমশাই ধীরে ধীরে উঠে চ'লে গেলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তাঁকে আর কোথাও পাওয়া যায় না, নিজের নির্জ্জন ঘরখানা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে আকর্ষণ করতে থাকে। বাইরেও যেমন তিনি শান্তিপ্রিয়, অন্দরেও তিনি তেমনি নিভৃত।

পথটা কম নয়, মন্থর পদক্ষেপে তিনি বাড়ীতে এসে পৌছলেন। অত বড় বাড়ীর যে দিকটায় তিনি থাকেন সেদিকে কেউ পা মাড়াতে সাহস করে না। ভয়ে নয়, পাছে মাষ্টারমশায়ের নিঃসঙ্গ তপস্যা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়। মা আছেন, ভাই আছেন, তাঁরা সংসারী মানুষ—কিন্তু তাঁরা যেন বিদেশী মানুষ, যেন আলাপই আছে, আত্মীয়তা নেই। এদিকে আসাটা যেন তাঁদের অভ্যাসের বাইরে।

রাত অল্পই হয়েছিল। সবেমাত্র গায়ে একখানা র‍্যাপার জড়িয়ে মাষ্টারমশায় টেব্‌ল ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে বিছানায় বসে একখানা বই খুলেছেন, এমন সময় দরজার বাইরে শব্দ শোনা গেল। আলো পার হয়ে ওদিকে অন্ধকারে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হোলো না, বইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়েই তিনি বললেন, চন্দর বুঝি? ঠাকুরকে ব'লে দিয়ো রাতে আমি কিছু খাবো না।

চন্দর নয়, আমি এলুম। আমি মৃণাল।

মাষ্টারমশায় মুখ তুলে দেখলেন, মৃণাল ততক্ষণে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি ব্যস্ত হলেন না, শুধু হেসে বললেন, এসো মৃণাল, এসো, এমন অসময়ে যে ?

দিদিমাকে এনেছি সঙ্গে, তিনি ওবাড়ীতে বসে গল্প করছেন।

বিছানার একটা দিক দেখিয়ে মাষ্টারমশাই বললেন, বসো এখানে, গল্প শুনতে বুঝি ভাল লাগল না ? গল্প শোনার বয়স ত তোমার এখনো পার হয়নি ?

মৃণাল হেসে উঠল—অত ছেলেমানুষ আমাকে মনে করবেন না। আমি তেইশ বছরের বুড়ি।

তাই নাকি ? তবু তুমি খুসি হবে এমন কিছু নেই আমার কাছে। এ বইগুলো কি জানো ত ? শ্রীঅরবিন্দর গীতার ব্যাখ্যা, আর এখানা বিবেকানন্দের জীবন চরিত।

আপনি যে আগে সাহিত্য আর দর্শন পড়তেন ?

সে আগের কথা। এখন সব গুটিয়ে এনেছি এক জায়গায়। এখানা রোঁমা রোলাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ'।

রবিবাবুর বই পড়েন না ?

পড়তুম। কিন্তু এখন আত্মার আনন্দ আর চাইনে, এখন চাই নির্ব্বাণ।—মাষ্টারমশায় হাসলেন।

গীতায় কি নির্ব্বাণের কথা পাবেন ?

মাষ্টারমশাই হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে মাথার কাছে আলোটা

জ্বাললেন। তারপর হেসে বললেন, সে জন্যে গীতা পড়িনে, খুঁজে বেড়াই পথ, হাতড়ে বেড়াই বিশ্বাস পাবার জন্যে।

মৃণাল একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, আপনি এমনি ক'রে একলা থাকেন? বাবা রে, কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। এখানে থাকেন কেমন ক'রে?

মাষ্টারমশাই আবার হাসলেন। বললেন, চিরকালের অভ্যেস ছাড়তে পারিনে। তোমাদের তরুণী-সঙ্ঘ চলছে কেমন? শোনা যাচ্ছে তরুণী-সঙ্ঘের সভ্যারা চিরদিনের জন্য কৌমার্য্য ব্রত নিচ্ছেন, একি সত্যি?

অনেকটা সত্যি বটে, আপনাকে বুঝি বিজয়াদি বলেছেন?

হ্যাঁ বলেছেন যে শ্রীমতী মৃণালও তাঁদের দলভুক্ত।

মৃণালের মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল।

মাষ্টারমশাই বললেন, তুমি এসে ভালই করেছ মৃণাল, ভাবছিলুম চন্দরকে দিয়ে তোমার কাছে খবর পাঠাবো। বিজয়ার কাছে আজ তোমার কথাই হচ্ছিল।

মৃণাল মাথা হেঁট ক'রে বললে, আমিও আপনাকে সেই কথাই বলতে এসেছিলুম।

কি বলো?

মৃণাল একবার দরজার দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, আমার বিয়ের জন্যে আর আপনি চেষ্টা করবেন না।

মাষ্টারমশায় বলিলেন, তুমি কি ভাবছ, তার জন্যে আমার খুব পরিশ্রম হবে? তোমায় বিয়ে দেওয়ার পরিশ্রমটা আমার আনন্দের মৃণাল?

মৃণালের কণ্ঠে হঠাৎ একটু দৃঢ়তা ফুটে উঠ্‌ল। বললে, তা হোক, কিন্তু আপনি আজ থেকে নিরস্ত হোন্। বিজয়াদিকেও আমি ব'লে এসেছি।

তুমি কি এখন সত্য সত্যই বিবাহ করতে চাও না?

মৃণাল নীরবে মাথা হেঁট ক'রে রইল। উত্তর না পেয়ে মাষ্টারমশায় বললেন, কত ছেলেমেয়ে দেখলুম, দেখতে দেখতে চুল পাকল। কিন্তু মাঝে মাঝে এক এক জনকে দেখে চম্‌কে উঠি, ধ্যান ধারণা যায় বদলে। তখন মনে করি জানতে বুঝি কিছুই পারিনি। ভেবেছিলুম তোমার মত শান্ত আর নিরীহ মেয়ে বুঝি আর দেখিনি, এখন মনে হচ্ছে অন্য কথা।

কি বলুন ত? মৃণাল হেসে বললে।

মনে হচ্ছে এক জায়গায় তুমি ইস্পাতের মতন কঠিন, ইচ্ছাশক্তিটা তোমার দৃঢ়, মতামতটা অটল। তোমাকে বুঝতে পারা গেল না মৃণাল।

বোঝবার চেষ্টা করলেন কই?

তা করিনি বটে। হ্যাঁ, এ আমার ত্রুটি। ওপরটা দেখেই ভেতরটা চিনতে চেয়েছি। আর কি জানো মৃণাল, মেয়েদের স্নেহও

করি, ভালও বাসি কিন্তু বিচার ক'রে দেখিনে। স্নেহটা বিচারের পথ বন্ধ করে।

দুজনেই নীরব, কথা নেই কারো মুখে। কিন্তু মাষ্টারমশাই ভাঙলেন সেই নীরবতা। বললেন, কিন্তু মৃণাল বিয়ে করবে না কেন, বললে না ত?

বিয়ে করব না এমন কথা ত বলিনি? আপনিই কি সে কথা শুনতে চান? বহু লোক নিয়ে আপনার কারবার, অনেক মানুষের মধ্যে আপনার গতিবিধি, আমার কথা শোনবার সময় কই আপনার?

এই কি তোমার ধারণা?

এই আমার বিশ্বাস। আপনাকে সবাই সমীহ করে, আপনার চারদিকে ভয়ের গণ্ডি। সবাই থাকে আপনার আশ-পাশে, আর আপনি থাকেন অনেক দূরে। তার মধ্যে আমি কি আসব আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে? মৃণালের কণ্ঠস্বরটা সহসা ভারাক্রান্ত হয়ে এল।

মাষ্টারমশায় বললেন, ভিক্ষের মানে মৃণাল?

ভিক্ষেই ত। আমি গরিব, তাই ব'লে কি কাঙাল? সবাইকে আপনি যা দান করেন আপনার সে দান আমি ছুঁতেও চাইনে।

বিচিত্র ভাষা! জীবনে কোথাও মাষ্টারমশায় তিরস্কৃত হয়নি। তিনি হেসে বললেন, কি আশ্চর্য্য, আমি শুনতে চাই

এক কথা, তুমি বলতে চাও আর এক কথা। কি অপরাধ তোমার কাছে করলুম বলো ত?

মৃণাল কথা বলতে পারল না। বলতে গেলে ভাঙা গলার আওয়াজ বেরিয়ে পড়তে পারে।

মাষ্টারমশায় বিছানার উপর আড় হয়ে পড়ে বললেন, যাদের চুল পাকে তারা জ্ঞান সঞ্চয় করে বটে কিন্তু সেই পরিমানে বুদ্ধি হারায়। বুদ্ধির খেলা যৌবনে। আচ্ছা বলো মৃণাল, তোমার চরিত্রটা বুঝতেই আমার বাকি, তারপর না হয় বানপ্রস্থই নেওয়া যাবে। ব'লে অতি স্নেহে ও মমতায় তিনি মৃণালের একটি হাত ধরলেন।

হাতে কোনো উত্তাপ নেই, কোনো ভাষা নেই। এমন হাতের স্পর্শ মেয়েদের দুচোখের বিষ। হাতটা মৃণাল ছাড়িয়ে নিলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এক রকম অস্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই, বল্‌ব বলেই আসি, কিন্তু বলবার সুযোগ না পেয়ে চ'লে যাই। বলে সে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল।

*
* *

ভোর বেলা থেকে তরুণী-সঙ্ঘের অপিসটা জম্‌জম্‌ করছে। কলেজের আজ ছুটি, অণিমা আর ললিতার কোনো তাড়া নেই। মৈত্রেয়ী সকাল বেলাতেই এসে হাজির। নন্দরাণী ওধারে সবে-মাত্র ইংরেজী দৈনিক কাগজখানা খুলে বসেছে। দেশে আইন অমান্য অন্দোলন চলছে, এদিকটায় নন্দরাণীর বিশেষ ঝোঁক। বীর সত্যাগ্রহীদের খবরগুলো পড়তে পড়তে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। ওধারে সুনন্দা। সুনন্দার মন আজ ভালো নেই, কিন্তু সকাল বেলাতেই মন খারাপের সংবাদটা প্রকাশ হয়ে পড়ল বন্ধুদের কাছে বিদ্রূপ শোনবার একটা আশঙ্কা আছে। মুখখানা কোনোমতে লুকিয়ে সে চুপ করে বসেছিল।

কিন্তু বেলা সাড়ে নটা নাগাৎ সুনন্দা উঠে দাঁড়াল, তার সঙ্গে উঠল শিবানী আর নন্দরাণী। নন্দরাণী একা কোনোদিন আসেনা, এবং ফিরে যাবার সময় সঙ্গী তার একজন চাই। চাই কলেজে যাবার সময় পর্য্যন্ত চাকর তার সঙ্গে যায়।

সুনন্দা মাষ্টারি করে। দরিদ্র গৃহস্থের মেয়ে সে। বাবা তার অকর্ম্মণ্য। ছোট ভাই বোনগুলি তারই মুখ-চাওয়া। বর্ত্তমানে মাষ্টারি করে কিন্তু প্রাইভেটে তার বি-এ পরীক্ষা দেবার একটা

মতলব আছে। মেয়ে খুব পরিশ্রমী। তরুণী-সঙ্ঘের উপযুক্ত মেয়ে।

সাড়ে দশটার সময় সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। বাড়ী তার কাছেই। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়ে কিছুদূরে এসেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হোলো। পিছন থেকে ডাক পড়েছে।

—শোনো সুনন্দা, তোমাকে যে দেখিনি অনেকদিন। সংসার এখনো এত নিষ্ঠুর হয়নি, শোনো সুনন্দা—

জ্বালাতন করলে বটে তাড়াতাড়ির সময়। মুখে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে সুনন্দা বললে, আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে।

তা ত' যাচ্ছেই বলে একটি যুবক তার দিকে এগিয়ে এল, হেসে বললে, তোমার অনেক কাজ, তোমার ইস্কুল, জীবন সংগ্রাম। সত্যি, একটু সাবধানে পথ হেঁটো কিন্তু, আঁচলটা একটু সামলে। জানই ত, এটা বড় রাস্তা, ট্রাম বাস—কত কি বিপদ ঘটতে পারে।

সুনন্দা বললে, আপনি কি বলতে চান বলুন।

বলতে? কিছু না। তোমাকে দেখে হঠাৎ আনন্দ হোলো, ইচ্ছে গেল একটু বিদ্রূপ করা যাক্। বলবার এমন কিছুই নেই, এই কেবল দেখা হয়ে গেল তাই। কিন্তু এত তাড়া কেন বলো ত?

কি যে বলেন আপান তার ঠিক নেই।

হ্যাঁ, মাষ্টারী করা ভালো, টাকা পয়সা নৈলে কি আর স্বাধীন

হওয়া চলে? আজকাল স্বাধীন মেয়ের খুব ডিমাণ্ড, না, সুনন্দা? বাস্তবিক, আমি আজও বুঝতে পারলুম না সুনন্দা, মেয়েরা স্বাধীনতা চায়, না পছন্দসই বর চায়।

চলতে চলতে যুবকটি আবার বললে, এদেশের ছেলেগুলোর কথা আর বলো না সুনন্দা, ঘষে মেজে না নিলে ভদ্র সমাজে তাদের বা'র করা কঠিন।

সুনন্দা এবার ঠোকা দিলে। বললে, সে ত' আপনাকে দেখলেই কতকটা বুঝতে পারা যায়।—এই বলে সে আর দাঁড়াল না, ফুটপাথ থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে একখানা চলন্ত বাস দাঁড় করালো, এবং আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে হাতল ধ'রে উঠে পড়ল।

যাক্, নিশ্চিন্ত। সীট-এ ব'সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সে। বাঁচা গেল এ যাত্রায়। ও-লোকটার জন্য ওই পথটা দিয়ে আসা দিন দিন তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। লোকটাকে দেখলে ভয় করে, মনের মধ্যে একটা গোলমালও বাধে, আবার আঘাত দিয়ে কিছু বলতেও তার মুখে আসে না, অথচ এমনি করেই প্রশ্রয় পেয়ে গেছে। আলাপ ছিল, এমন কি, ঘনিষ্ঠতাও ছিল। চার্ম্ আছে লোকটার, আপাত ব্যবহারটাও খুব খারাপ নয়, মন-ভোলানো কথাও বলে, লোকটা শিক্ষিত। শিক্ষিত বলেই ওকে ভয় করে। ভদ্র বলেই বিপজ্জনক।

কারণটা সুনন্দা জানে। মাঝে মাঝে ওর চরিত্রের ভিতর

থেকে বন্য হিংস্র পশু উঁকি মারে, ভদ্রতার পালিশ যায় খসে। কুটিল সাপের কথা তখন সুনন্দার মনে পড়ে, মনে পড়ে চতুর শৃগালের কথা।

স্কুল এসে পড়েছে, সে উঠে পড়ল। কন্‌ডাক্টর চেন্ টেনে হাঁকল—একদম বাঁধকে, জেনানা—

জেনানা শব্দটা সুনন্দার ভালো লাগেনা। সে কি মূঢ় ম্লান মূক নারী-সাধারণেরই একজন? সে ত স্বচ্ছন্দেই নামতে পারে চলন্ত বাস থেকে যে কোনো ছেলের মতো। নামেনা কোনোদিন অবশ্য, কারণ লোকেরা কী মনে করবে! বাস্তবিক, লোকের ভয় না থাকলে ওই লোকটাকে তখন বেশ দুকথা শোনানো যেতো। ছেলেরা যতই শিক্ষিত হোক, কিন্তু মেয়েদের রক্তের ভিতরে থাকে একটি সহজ সৎশিক্ষা, নৈলে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভদ্রকন্যার আঁচল নিয়ে বিদ্রূপ—একি শুভ্র সমাজের যোগ্য!

পুরুষ মাত্রই চরিত্রহীন। এই সেদিনের কথা। সারকুলার রোড দিয়ে আসবার সময় এক ছোক্‌রা তার পিছু নিয়েছিল। পিছু পিছু এলেই যেন মেয়েদের মন জয় করা যায়। ক্ষুদ্রতার চেয়ে দৈন্যটাই বড়। আর একদিন, চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে আসবার সময়, ভাবতেও মাথা কাটা যায়, এক ছোকরা অশ্লীল গান ধ'রে দিলে।

স্কুলে এসে সুনন্দা দেখলে ঘণ্টা পড়ে গেছে। ফিফ্‌থ ক্লাসে

ফার্ষ্ট পিরিয়ড তার। মেয়েগুলো তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, দিদিমণি, নোমোস্কার।

হয়েছে, থামো। ব'লে সুনন্দা নাম সই ক'রে আসতে গেল। ক্লাসে এসে সে যখন দাঁড়াল, মেয়েগুলো তখন কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে। এখনো অনেকেই ফ্রক্ পরে, যারা সাড়ী পরে তারা পরে কানে দুল, মাথায় আঁটে ক্লিপ। প্রসাধনের প্রতি মেয়েদের প্রকৃতগত পক্ষপাতীত্ব, মন তাদের বড় সচেতন।

রোল্ কলের পর টাস্ক দেখা হোলো। যারা দেখাল না তাদের মধ্যে নীলিমা একজন। মেয়েটা এই সেদিন ভর্ত্তি হয়েছে। লাষ্ট বেঞ্চে বসে থাকে, পড়া জিজ্ঞেস করলেই ভ্যাক্ ক'রে কেঁদে ফেলে। কে একটা দুর্বিনীত মেয়ে সেদিন বাড়ী থেকে এক চিমটি হলুদবাটা এনে অলক্ষ্যে তার সাড়ীতে মাখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, তোর বুঝি আজ গায়ে হলুদ হয়েছে?

অপমানে আর লজ্জায় নীলিমার কী কান্না।

ঘণ্টা তিনেক পরে সুনন্দা টিফিন ঘরে চলে গেল। জনতিনেক লেডি-টিচার বাক্যালাপ করছিলেন। আলাপগুলি ঘরোয়া। সলিলাদি শয়ন কক্ষে কি রকম ভাবে রান্না-বান্না করেন, করুণাদির বোনঝির বিয়েতে কে কি দিয়ে মুখ দেখেছে, অমুকের ভগ্নির মুখ চোখ ভাল—ইত্যাদি। সুনন্দা তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসল।

স্কুলের ঝি গিয়েছিল বাসায়, এতক্ষণে ফিরে এল। বললে, দিদিমণি, আপনার একখানা চিঠি, এই নিন্।

চিঠি সকলেরই আসে। চিঠি খুলে পড়ছে সে, ওধার থেকে করুণাদি কৌতূহলী হয়ে বললেন, কাকার ওখান থেকে এলো বুঝি?

না।

মামার ওখান থেকে?

না।

মায়াদি একটু হেসে বললেন, বন্ধুর চিঠি তাহলে?

হ্যাঁ।

সলিলাদি' চট্ ক'রে বললেন, বোধ হয় তরুণী-সঙ্ঘের বন্ধু? মেয়ে বন্ধু ত?

মেয়ে নয়—ব'লে উত্যক্ত হ'য়ে সুনন্দা উঠে গেল।

তারপর অঙ্ক আর বাংলা পড়িয়ে কোনোক্রমে দুঘণ্টা কাটল। আর মন বসে না। মন না বসলেও পড়াতে হয়, জীবন সংগ্রামের প্রশ্ন। মা নেই, দরিদ্র পিতা, ছোট ছোট ভাই বোন। কিন্তু যাক্ সে কথা। ঘড়ির দিকে সুনন্দা তাকাল। তিনটে বাজে। ঘড়ির কাঁটা যেন আর নড়তে চায় না। বন্ধ হয়ে যায়নি ত? চিঠিখানা যেন তীরের মতো তাকে এসে বিঁধেছে। শিকারী বোঝেনা হরিণীর বুকের যন্ত্রণা। নিষ্ঠুর, সব নিষ্ঠুর।

দিদিমণি, হাতী মানে এলিফ্যাণ্ট কেন? হাতীর ত চারটে পা আছে, না দিদিমণি?

বিস্ফারিত বিস্ময়ে সুনন্দা তার দিকে চাইলে। হাতী মানে এলিফ্যাণ্ট কেন? তাই ত, সে যেন স্বপ্ন দেখছে। কেন, কে জানে! কিছুই জানা যায় না, সবই দুর্জ্ঞেয়, সমস্তই জটিল।

প্রশ্নকারিণীটি বসে পড়ল। ক্লাসে গোলমাল চলছে। একখানা বেঞ্চে এই নিয়ে বিবাদ বেধেছে, কার হাতের সোনার চুড়ির দাম বেশি, কা'র খাতায় গান লেখা ধরা পড়েছে—কিন্তু সুনন্দার মনে হচ্ছিল, নির্জ্জন, সে এখন নিতান্তই একা। বাল্যকাল থেকেই সে একা। কোথায় একটি গোপন দম্ভ তার আছে, একটি আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বোধ, যার জন্য সে কাউকে গ্রাহ্য করেনি, বশ্যতা স্বীকার করেনি।

স্কুল থেকে বেরিয়ে একা পথে নেমে সে আবার চিঠিখানা খুলে পড়ল। প্রথম সম্ভাষণ থেকে নাম সই পর্য্যন্ত যেন গায়ে একটা জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সুস্পষ্ট ভাষা, পরিচ্ছন্ন বিষয়-বস্তু, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল বচন-বিন্যাস। কিন্তু এই চিঠির সঙ্গে যার জীবন লিপ্ত, সেই জানে এর শাণিত তীক্ষ্ণতা, এর মার্জ্জনাহীন নির্দ্দয় প্রয়োগ। সুনন্দা ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

ফিরবার সময় আসে অন্য পথ দিয়ে। কিন্তু বাসার কাছা-কাছি এসে সে হঠাৎ মোড় ফিরল। ফিরবে না সে এখন, ফিরলেই

তাকে শুয়ে পড়তে হবে। সেই জানলা, সেই একলা আকাশ, সেই নিরবচ্ছিন্ন ভালো না লাগা। শরীরে শক্তি নেই, মনে নেই আনন্দ, —তবু সময়ের রথের চাকা তাকে দ'লে পিষে চলতে থাকবে।

দুখানা বাস চলে গেল। তৃতীয়খানাকে থামিয়ে সে উঠল। একটা লোক সসম্মানে তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে স'রে গেল। মেয়েদের প্রতি এই অতি সম্মান বিসদৃশ, দৃষ্টিকটু, দৈন্যের উপরে যেন ভদ্র আবরণ জড়ানো। সুনন্দা নির্বিকার হয়ে বসে রইল। গাড়ী ছুটছে। নগরীর মুখর কোলাহল, জনস্রোত, যানবাহনের শব্দ—তাদের দিকে চেয়ে সুনন্দার চোখের উপর চিঠির ভাষাটা যেন এসে দাঁড়াল। কত কটূক্তি, ব্যঙ্গ, পৃথিবীতে যেন সবাই ভালো, সকলের মন [illegible] পরা, কেবল সেই খারাপ, সেই ইতর। যার কাছে সব চেয়ে ভালো কথা শোনবার, তার কাছেই শুনতে হয় সকলের চেয়ে যা অশ্রাব্য। মনে পড়ে প্রথম দিনকার কথা। কত সৌজন্য আর ভদ্রতা, কত পালিশ। সেদিন জানা ছিলনা, এদের পিছনে ছিল পুরুষ-চরিত্রের অখণ্ড বর্ব্বরতা, অলজ্জ অহঙ্কার।

একটা পথের মোড়ে নামতেই পিছন থেকে ডাক পড়ল, এই সুনন্দা, এদিকে কোথায় রে?

সুনন্দা মুখ ফেরালে। বন্ধুর কাছে গিয়ে হাত ধরে বললে, তোর ওখানেই যাচ্ছিলুম শৈবলিনীদি! ছেলে কেমন আছে?

আজ একটু ভালো। আয়।—দুই বন্ধুতে চলল।

কাল তুই প্রসেসনে যাসনি কেন রে?—সুনন্দা বললে।

শৈবলিনী বললে, ভয়ের জন্য নয় ভাই। ছ-মাস খেটেছি, আরো না হয় ছমাস…কিন্তু ওঁর ভাই শরীর খারাপ, ছেলেমেয়েরা কষ্ট হয়—এবারে কা'র কাছে রেখে যা'বো?

সুনন্দা বললে, আমারো ইচ্ছে ছিলনা যাবার, দূরে দূরে ছিলুম। বিজয়াদি নাকি আর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

শৈবলিনী বললে, সান্ত্বনাদি ইস্কুলের মেয়েদের দিয়েছিল এগিয়ে…যদি মার-ধোর হয়। সরলাদিকে জগৎবাবু যেতেই দেননি। বলেছেন, এবার যদি জেলে যাবে আমি আফিং খাবো।

দুজনেই হেসে উঠল। জগৎবাবু আর সরলার জেলের ইণ্টারভিউর কথা সকলেরই মনে আছে। আফিস-রুমে বসে স্বামী স্ত্রীর গলা ধরাধরি ক'রে সে কী কান্না! জেল-গেটের ফাঁক দিয়ে তাদের বিরহ-মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে কুমারী মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়েছিল। বাস্তবিক, সরলাদির মতো মেয়েদের স্বদেশী করা উচিৎ নয়। জেল কর্ত্তৃপক্ষরা হাসাহাসি করে।

কথায় কথায় দুজনে এসে দাঁড়াল শৈবলিনীর বাড়ীর দরজায়। একখানা প্রাইভেট্ মোটর দাঁড়িয়ে। দেখা গেল, শৈবলিনীর স্বামী আফিস থেকে ফিরেছেন। সুনন্দার সঙ্গে তাঁর নমস্কার

বিনিময় হোলো। তিনি বললেন, গাড়ী পাঠিয়েছেন অণুভা দেবী, আপনিও যাচ্ছেন ত?

সুনন্দা বললে, হ্যাঁ, আজ তার ছেলের অন্নপ্রাশন, কিন্তু আমার আজ কাজ রয়েছে জামাইবাবু।

গেলে কিন্তু অনুভা আহ্লাদ করত। শৈবলিনী বললে।

আজকে না শৈবলিনীদি, আর একদিন।

গাড়ী দাঁড়িয়ে, সুতরাং আর দেরি চলেনা। শৈবলিনী কাপড় বদলাতে গেল ঘরে।

যথাসময়ে স্বামী স্ত্রী গাড়িতে উঠলে সুনন্দা বিদায় নিলে। খানিকক্ষণ সময় তার কাটল, এখন তাকে অনেক দূর যেতে হবে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে মন একটু হাল্‌কা হয়েছে।

চিঠি লিখে যে লোকটা এমন অপমান করেছে, স্নেহ-মমতার মূল্য যে লোকটা জীবনে দিতে শেখেনি, তার কাছে ভিখারিণীর মতো আর সে যাবেনা। যাক আজ একটা ভয়ানক আত্ম-অপমান থেকে সে বেঁচে গেল। বাঁচালো শৈবলিনী। শৈবলিনীর কাছে সে কৃতজ্ঞ। চলন্ত ট্রামে উঠে সুনন্দা ভাবতে লাগল, তার জীবন-জোড়া হঠকারিতা। কেবল তার ক্ষণিক উত্তেজনা, ইম্‌প্যাল্‌স্‌! সে অত্যন্ত ইম্‌প্যাল্‌সিভ। রাজনীতি, পিকেটিং, প্রসেশন, ফ্ল্যাগ ওড়ানো, জেল খাটা—সব করা হয়েছে, কিন্তু তৃপ্তি হয়নি। যা কিছু সে ছুঁয়ে এসেছে, কিছুরই ওপর তার মমতা জন্মায়নি;

কিছু একটা দুর্লভকে সে খুঁজে বেরিয়েছে, গভীরকে খুঁজেছে, খুঁজেছে অনির্ব্বচনীয়কে।

ঘরের ভিতরে তার ভালো লাগেনি—সুনন্দা ভাবছিল, তাই বাইরে স্বাধীনতার জন্য সে চেঁচিয়ে বেড়িয়েছে। ঘরে অসহ্য বন্ধন, বাইরে যন্ত্রণাদায়ক তৃপ্তি। সুন্দর সংসার কি সে কামনা করেছিল? কে জানে! আর্থিক স্বাধীনতা? অবাধ চলাফেরা? কিন্তু এদের মধ্যে মনের খোরাক কই?

কন্‌ডাক্‌টরের কাছে টিকিট নিয়ে সে আবার নীরবে বসে রইল। তার খেয়ালই হোলো না যে, ট্রান্‌স্‌ফর্ টিকিট নিতে হবে।

টার্‌মিনাসের কাছাকাছি এসে সে নেমে পড়ল। কি একটা স্বদেশী সভা উপলক্ষ্যে হৈ চৈ ক'রে লোকজন চলেছে। মেয়েরাও যাচ্ছে, জেলের পরিচিত কোনো কোনো মেয়েকেও দেখা গেল। তাদের নেশা আজো কাটেনি, দেশকে স্বাধীন না ক'রে আর তাদের বিশ্রাম নেই—সুনন্দা সবাইকে এড়িয়ে চল্‌ল অন্যপথে। আজ যদি তাকে কেউ সভামঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয় তবে সে চীৎকার ক'রে ওই মেয়েদের উদ্দেশ করে বলতে পারে, তোমাদের সব মিথ্যে, তোমরা হৃদয় খোঁজবার জন্য বেরিয়েছ, স্বাধীনতার জন্যে নও। জানি, তোমরা কী চাও!

এদিকে কোথায়? মিটিং শুনতে?

অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ, হ্যাঁ, অতি পরিচিত। মনে হোলো ছিদ্রলেশহীন রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে একটা শব্দ যেমন বহুক্ষণ ধ'রে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তেমনি ক'রে সেই কণ্ঠস্বর সুনন্দার দেহের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সে নিমেশ-মাত্র, পরক্ষণেই সে মুখ ফেরালে, এবং একটি যুবকের আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললে, আমি···আমি আশা করিনি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

তার চোখে অশ্রু এসে দাঁড়াল হঠাৎ।

যুবকটি বললে, তুমি নয়, আপনি। এটা রাস্তা।

দুজনে জনতা কাটিয়ে একটু নিরিবিলি পথে এলো। দুজনে পাশাপাশি, কাছাকাছি। সুনন্দার শরীরের সমস্ত রক্ত মুখের উপর উঠে উত্তেজনায় ছুটোছুটি করছে। বললে, আমি আশা করিনি···অপ্রত্যাশিত দেখা তোমা—আপনার সঙ্গে! আমি ভাবতেই পারিনি যতীনবাবু।

যতীন বললে, আমিও তাই ভাবছি।

সুনন্দার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। বললে, আজ দুপুরবেলা আপনার এই চিঠি। আমি—আমি কী অন্যায় করেছি যে এমন চিঠি আমায় লিখতে হবে?

আবার এলো তার চোখে জল।

যতীন বললে, পথের মাঝখানে বেশি কথা বলা চলেনা! কিন্তু

তোমার কি ধারণা আমি ভালোবেসেছিলুম ?—ব'লে সে এক-প্রকার নির্দ্দয় হাসি হাসলে—ভালো আমি কাউকেই বাসিনে! যাকগে, আমাকে যেতে হবে এখনি, কাজ আছে।

পা বাড়াতেই সুনন্দা বললে, এমন সময় তোমার নেই যে আমার বাসা পর্য্যন্ত যাও?

না। একা তুমি বেশ যেতে পারবে?

এই ব্যবহার কি ঠিক হোলো?

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলুম সুনন্দা। বন্ধুত্ব মানে প্রেম নয়, মনে রেখো?

নয়? মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বর কি আর কোনো অর্থ আছে? সুনন্দা বাসার পথ ধরল। সন্ধ্যার আর দেরি নেই।

পথ-বাট যেন তখনো দুলছে, দুধারের বাড়ীগুলো যেন জীবন্ত জন্তুর মতো লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে। বন্ধুত্ব মানে প্রেম নন! তবে কী?

আবার সেই সকাল বেলাকার সুরেশের সঙ্গে দেখা। সুনন্দা ফিরে তাকাল। লোকটা বললে, আঁচলটা সামলে সুনন্দা।

সুনন্দা চোখ রাঙিয়ে বললে, অসভ্যতা যদি করেন আপনি, আমি পুলিশ ডাকব। কুকুর কোথাকার!

আহা, রাগ কর কেন? বলছি যে, পথ চেয়ে হাঁটো, অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে। দেশ-কাল খারাপ!

আপনার উপদেশ দেবার দরকার নেই।

বেশ, দেবোনা। কিন্তু পৃথিবী ত আর মরুভূমি নয়, কিছু কিছু পাওয়া যায় বৈ কি। হতাশ হোয়োনা সুনন্দা!

সুনন্দা পিছন ফিরে তরুণী-সঙ্ঘের আফিসের দিকে চলতে লাগল।

*

* *

তরুণী-সঙ্ঘের যে দুতিনটি মেয়ের সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে তাদের মধ্যে সুমিত্রা একজন। বিবাহটা অসবর্ণ। অনেকদিন থেকেই সুমিত্রার গতিবিধিটা সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিল। এই নিয়ে অণিমার দলের পক্ষ থেকে নানা কটাক্ষ, মৈত্রেয়ীর নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সুমিত্রাকে সইতে হয়েছে। কিন্তু বিবাহটা বন্ধ হয়নি, পাত্রের সঙ্গে সুমিত্রার ছিল পূর্ব্বরাগ—মিলনের জন্য তাদের পরস্পরকে অনেকখানি স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ ভালোবাসাটা আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ চেয়ে চলেনি।

সেদিন দোতালার বারান্দায় মুখোমুখি দুখানা ইজিচেয়ারে স্বামী স্ত্রী বসেছিল। সুমিত্রার হাতে একখানা বাংলা মাসিকপত্র, এবং শ্রীশের হাতে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। দুজনেই অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ। সুমিত্রার মনোযোগ মাসিকপত্রের দিকে নেই এবং শ্রীশ তার সিগারেটের ক্রমবিলীয়মান ধূম্রকুণ্ডলীর দিকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিল। পশ্চিম দিকে রক্তরাগময় সূর্য্য দেবতা ধীরে ধীরে অস্তে নামছেন। বাতাসটা স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে।

নীরবতা ভাঙলে শ্রীশ। বললে, আজ নিয়ে কদিন হোলো আমাদের বিয়ে হয়েছে সুমিত্রা?

থামো।—কাগজখানা সরিয়ে উত্যক্ত কণ্ঠে সুমিত্রা বললে, রোজ এক কথা ভালো লাগে না। বিয়ে যেন কেবল তুমিই করেছ।

শ্রীশ হেসে বললে, রাগ করো কেন? এক মাস এখনো হয়নি তাই বলছি। তোমার মেজাজ আজকাল বড় রুক্ষ হয়ে উঠেছে সুমিত্রা।

সুমিত্রা আবার মাসিকপত্রের দিকে মনোনিবেশ করলে। কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই সে পুনরায় বললে, আসল কথাটা তোমার আমি জানি। বললে তুমিও রাগ করবে।

রাগ করব কেন, বলই না।

সুমিত্রা বললে, আত্মীয়দের ত্যাগ ক'রে তুমি দুঃখ পাচ্ছ।

সে কথা বলাই বাহুল্য। যাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাদের ত্যাগ ক'রে দুঃখ পায় না কে?

অনেকেই পায় না। কিন্তু যাদের ওপর এত টান তাদের ভাসিয়ে দিয়ে এমন দুঃসাহসিক বিয়ে না করলেই পারতে?

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীশ সোজা হয়ে বসল। বললে, বিয়ের আগে তুমি কিন্তু এমন কথা কোনোদিন বলোনি। আজ চার বছর তোমার সঙ্গে আমার আলাপ। তুমি বরাবর ভালই বেসেছ কিন্তু আঘাত করতে শিখেছ এই অল্প কদিন মাত্র।

মাসিকপত্রটার উপরে চোখ রেখে এক সময় সুমিত্রা বললে,

তোমার কেবল বাজে কথা। তোমার কথা শুনলেই মনে হয়, বিয়ে ক'রে যেন তুমি আমাকে কৃতার্থ করেছ। যেন দাতা আর গ্রহীতার সম্পর্ক।

এমন সময় ঠাকুর এলো চা ও খাবার নিয়ে। দুজনের মাঝখানে টিপাইয়ের উপর সেগুলি রেখে সে স'রে দাঁড়াল। সুমিত্রা মুখ তুলে বললে, তোমার কি আজ না গেলেই চলবে না ঠাকুর?

ঠাকুর মাথা চুলকে বললে, অসুখের চিঠি মা, না গিয়ে থাকি কেমন ক'রে। রাত্ত নটার গাড়ি। এ বেলার রান্না হয়ে গেছে।

শ্রীশ হেসে বললে, এ বেলার রান্না না হয় হোলো কিন্তু কাল থেকে কি হবে হে?

সুমিত্রা বললে, এমন জ্বালা আমার সয় না। সেদিন আলু সেদ্ধ করতে গিয়ে আমার হাতটা গেল ঝলসে। রান্না করা আমার অভ্যেস নেই বাপু।

তোমাকে রান্না করতে বলছিনে আমি।

বলচ না কিন্তু কাজে ঘটবে তাই। যেখান থেকেই হোক লোক ধ'রে আনো।

বেশ। ঠাকুর, এসো ত আমার সঙ্গে?—ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে শ্রীশ হন হন ক'রে চলে গেল।

পিছন থেকে সুমিত্রা বললে, চা খেয়ে গেলে কি দোষ হোতো?

শ্রীশের কাণে সেকথা গেল না। বোঝা গেল এ তার রাগ। এ রাগ তারই ওপর, একথা বুঝতে সুমিত্রার এক মুহূর্ত্ত লাগল না। কিন্তু কী বা করা যায়, রান্না করা তার অভ্যাস নেই। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সুমিত্রা অল্প অল্প চুমুক দিতে লাগল। এমন রাগারাগি আজ নতুন নয়।

সূর্য্য গেল অস্তে। লাল আভাটুকু ধীরে ধীরে গেল মিলিয়ে। শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিল। আজ তরুণী-সঙ্ঘে একবার যাবার কথা ছিল, অণিমার ডাক। একটা জরুরী সভার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু আকাশের দিকে একান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে সুমিত্রা নীরবে বসে রইল। এই চন্দ্র তাদের জীবনের একটি প্রধান সাক্ষী। চার বছর আগে থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের পরস্পরের জীবনের প্রগতিকে যে অবিরত লক্ষ্য ক'রে এসেছে সে ওই চন্দ্র। বাস্তবিক, ছেলেমানুষী করেছে তারা অনেক। কত কল্পনা, কত স্বপ্নজাল, কত রঙীন আশা সৃষ্টি করেছিল তারা দুজনে। সুখময় দিন সেগুলি সন্দেহ নেই। মাঠে, নদীর ধারে, রেলপথে, দেশ-দেশান্তরে তাদের একত্র ভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী স্মরণ করলে এখনো আনন্দে প্রাণ দুলতে থাকে। সেদিন ভালোবাসাটাই ছিল বড়, পরিণতির চিন্তাটা ছিল মনের অগোচরে। বোঝা যায় না কোন্‌টা সত্য—আজকের এই অভাব অভিযোগের কলহময় সংসার, না সেদিনের দায়িত্বজ্ঞানহীন অবিশ্রান্ত আনন্দোচ্ছলতা!

খানিক রাতে শ্রীশ ফিরে এলো। রান্নার লোক পাওয়া গেল না। দু একজন যা জুটলো তাদের দাবি মেটানো এই ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে ঠাকুর রাত আটটা নাগাৎ বিদায় নিলে।

ইতিমধ্যেই সুমিত্রার মনটা নরম হয়ে এসেছিল। পিছন থেকে এসে শ্রীশের পিঠের উপর একখানা হাত রেখে সে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বললে, কী রাগ তোমার, চা পর্য্যন্ত তখন খাওয়া হোলো না। এখন রাগ পড়েছে ত?

শ্রীশ বললে, না পড়লে চলবে কেন বলো। রান্নার জন্যে কি আর ভয় করি, আমি নিজেই রাঁধব সুমিত্রা।

তুমি রাঁধবে, তা ভালো। কিন্তু আজকে যদি ঝিটাও চলে যায়, বাসন মাজবে কে? ঘরের কাজকর্ম্মইবা কে করবে?

ভারি কাজ। কেন, তুমি যদি না পারো আমিই করব?

সুমিত্রা এবার না হেসে পারলে না। বললে, তুমি এসব করলে আমাকে টাকা রোজগার করতে বেরুতে হয়। রাজি আছো ত? হয়েছে এখন, খুব বাহাদুর, দয়া ক'রে এবার খাবে চলো।

শ্রীশ গম্ভীর হয়ে বললে, আজকের খাবারগুলো রেখে দিলে কেমন হয়? ধরো কাল সকালে যদি রান্নাবান্না না হয়ে ওঠে?

সুমিত্রা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, তারপর শ্রীশের গলা জড়িয়ে

চুম্বন ক'রে বললে, তোমার একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। আমিই রাঁধব গো, আমিই রাঁধব। রাঁধতে রাঁধতেই রান্না শিখে নেবো।

বাঁচলুম। ব'লে হেসে শ্রীশ উঠে দাঁড়াল। একটা ভয়ানক সমস্যার হাত থেকে সে যেন মুক্তি পেয়ে গেল।

আহারাদির পর রাত্রে তারা বারান্দায় এসে বসল। বহু নিভৃত রাত্রেই এমনি ক'রে তারা মুখোমুখি গল্প করেছে। কিন্তু আজ যেটুকু পরিবর্ত্তন তাদের হয়েছে সেটুকু কারো চোখ এড়ায় না। বলা বাহুল্য, সেদিন বাধা ছিল অনেক; ভয়, দ্বিধা, লোক-লাঞ্ছনা, নানা বিদ্রূপ ও বিপত্তি। তাই ক্ষণিক মিলনেও ছিল গভীর আনন্দ; পরস্পরের সান্নিধ্য-লাভের উৎকণ্ঠায় তাদের প্রহর গুণে দিন কাটত। আজ সেই নেশাটা আর নেই। মন এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে, পাওয়ার বস্তু পাওয়া হয়ে গেছে।

সুমিত্রা বললে, ঘুম পায়নি তোমার?

শ্রীশ বললে, আজ না হয় জেগেই রাতটা কাটিয়ে দিই। ঘুম ত আছেই।

বেশ কথা। তবে কি বসে বসে যোগ-সাধনা করবে; তোমার সখ দেখলে গা জ্ব'লে যায়।

শ্রীশ বললে, ঘুমটাই কি তোমার বড় হোলো সুমিত্রা? আর এই ব'সে থাকাটা কি কিছুই নয়?

সুমিত্রা বললে, বসে বসে ভালোবাসার কথা শুনতে হবে ত?

শ্রীশ অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললে, শোনালে কি তুমি রাগ করবে?

রাগ নাই করলুম কিন্তু আর্দ্ধেক রাতে সেই পুরনো কথাগুলো আওড়াতে তোমারই কি ভালো লাগবে? অবস্থার গুণে অনেক কথার রঙই ফিকে হয়ে আসে।

দুজনেই চুপ ক'রে রইল। তাদের পূর্ব্বেকার অবিশ্রান্ত আলাপে কোথায় যেন একটি গভীর শ্রান্তি এসেছে। আর যেন সহজে কথা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুমিত্রা বললে, কাল বেরোবার আগে কিছু টাকা রেখে যেয়ো, পাওনাদারদের সব টাকা এখনো শোধ হয়নি। তাদের হিসেব শুনলে আমার বাপু মাথা খারাপ হয়ে যায়।

এ কথাটা শ্রীশের মনেই ছিল না। পাওনাদার শুনলেই তার মন চমকে ওঠে। বৃহৎ পরিবার ও আত্মীয় পরিজনের ভিতরে সে মানুষ, এবং সে পরিবার একান্নবর্ত্তী—সংসারের খুঁটি-নাটি, দেনা-পাওনা, চাল-ডালের হিসেব, এ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞতা নেই। মনে হোলো সে যেন একটা ভয়ানক গোলকধাঁধার মধ্যে প'ড়ে গেছে, কে যেন শক্ত দড়ি দিয়ে তাকে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধতে উদ্যত হয়েছে, তার আর পালাবার পথ নেই।

ঘুমোলে নাকি? সাড়া দিচ্ছ না যে?

শ্রীশ করুণ কণ্ঠে বললে, কত টাকা দিতে হবে?

তা আমি জান্‌ব কেমন ক'রে? তারা এসে হিসেব দেবে।

তুমি হিসেব রাখোনি সুমিত্রা?

হিসেব ত তারা রাখতে বলেনি। তারা কেবল টাকাই চায়।

শ্রীশ সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে বললে, কিসের বদলে টাকা চায় সেটা জানতে হবে না?

তা বটে, এ কথাটা সুমিত্রার মনে নেই। কিছুই সে ভাবতে পারছে না, কে কি সরবরাহ করেছে তার কিছুই খেয়াল নেই, কোন্‌টার কি দাম সে জানেই না, ক'জন পাওনাদার—সে হিসেবও তার করা নেই। ভয়ানক সমস্যায় তার মাথার ভিতরে সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। ব্যস্ত হয়ে সে বললে, তুমি বাপু সামনে দাঁড়িয়ে সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে যেয়ো। এই গোলমালে যে আমাকে পড়তে হবে এ আমি স্বপ্নেও জানতুম না।

কিন্তু টাকা পাবো কোথা?—শ্রীশ বললে।

কেন, তোমার টাকা নেই?

ছিল ত, কিন্তু সে টাকা যে সেই মাদ্রাজীটা কিন্‌তে ফুরিয়ে গেছে! তখন ত কই পাওনাদারের কথা বলোনি।

চোখ কপালে তুলে সুমিত্রা বললে, তাহলে কি করবে? অপমান করবে যে তারা!

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে শ্রীশ বললে, কাল বাবার কাছ থেকে টাকা আনব।

সুমিত্রা বললে, বামুনের ছেলে হয়ে শূদ্রের মেয়েকে বিয়ে করেছ, জাত গেছে, তিনি এখন টাকা দেবেন কেন ?

তা বটে। এ কথাটা শ্রীশের মনে ছিল না। ভয়ে তার চোখ দুটো বুজে এলো। সমুদ্রের ভিতরে সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে। বাড়ী ভাড়া, দুধের কর্দ্দ, মুদির হিসেব, কয়লাওলা, ধোবা—সবগুলো যেন কালো কালো দৈত্যের মতো তার মাথার ভিতরে লাফালাফি করতে লাগল। কে যেন তার টুঁটি টিপে ধরেছে। আশ্চর্য্য, বিয়ের আগের দিন পর্য্যন্ত এই সমস্যাগুলো তাদের পরস্পরের বিবেচনার মধ্যে প্রবেশ করেনি। মিলিত জীবনের সুখ কল্পনাটাই তাদের ছিল, কিন্তু তার স্থূল বাস্তব দিকটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আজ সবাই যেন ভীষণ একটা ষড়যন্ত্র ক'রে হিংস্র নখর প্রসারিত ক'রে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার কাছে একটি আংটিও নেই, সুমিত্রার গায়ে নেই একটি অলঙ্কার। যা কিছু ছিল, অসবর্ণ বিবাহের মহান্ আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে খরচ হয়ে গেছে। আদর্শের পিছনে ছোটার এই কি পরিণাম ?

সুমিত্রার হাতের রান্না আজ প্রথম শ্রীশ খেলে। হাঁ, রান্না বটে। পরম যত্ন ও পরমতর তৃপ্তিতে গ্রাসগুলি একে একে গলাধঃকরণ ক'রে এক সময় শ্রীশ উঠে গেল। এবং তারপর সে তল্লাটে আর তার দেখা পাওয়া গেল না।

আধঘণ্টা পরে সুমিত্রা চীৎকার করতে করতে ছুটে এল। ভাত-মাখানো হাত, মুখে তরকারির দাগ, চোখ দুটো রাঙা। শ্রীশ ঘরের ভিতরে কাঠ হয়ে বসেছিল। তাকে দেখেই তীব্রকণ্ঠে সুমিত্রা বলতে লাগল, এমন ঠাট্টা আমার সঙ্গে? একটিও কথা বললে না, মুখ বুজে খেয়ে এলে? এর নাম কি রান্না? ছাই, একেবারে পাঁচন! নুন নেই, হলুদের গন্ধ—ডালের মধ্যে ধনেবাটা তুমিই ত দিতে বলেছিলে… থু, থু, ওয়াক্…

ছুটে সে বমি করতে করতে বেরিয়ে গেল। একেবারে তোলপাড় কাণ্ড। চোরের মতো শ্রীশ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে, হাত পা ছুড়ে, কেঁদে, কটূক্তি ক'রে সুমিত্রা একেবারে হাট বাধিয়ে বসল।

অতঃপর সেদিন থেকে দোকানের খাবার এনে ক্ষুধা নিবৃত্ত করবার ব্যবস্থা হোলো।

কিন্তু এমন করলে সংসার চলে না। কোথায় যেন একটা বিশ্রী ছন্দপতন ঘটে যাচ্ছে। গৃহস্থালীর মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, আয়-

ব্যয়ের কোনো সামঞ্জস্য নেই। একজনের চোখে আর একজন অতি অকর্ম্মণ্য। দুজনের মেজাজই রুক্ষ, দুজনেরই দিন দিন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। বিবাহের আনন্দ দেখতে দেখতে তাদের মলিন হয়ে এল।

তুমি আমাকে জেনে-শুনে জব্দ করেছ।—ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে সুমিত্রা একদিন অনুযোগ ক'রে বসল।

শ্রীশ বললে, তুমি কি জানতে না মেয়েমানুষের ওপরই সংসার গোছানর ভার?

তোমার ভার যে সংসার চালানো, তুমি তার কি করেছ? বিয়ে করার পরের বিপদটা তুমিও কি জানতে না?

সব কিছু আমার জানার কথা নয়।

আমারো নয়। যা খুসি তুমি করোগে। আমি ইচ্ছে করেই নিজেকে এমন বিপদে ফেলেছি আমারই দোষ। বলতে বলতে সুমিত্রার গলা ধ'রে এল।

তার কান্না দেখে শ্রীশ আরো চটে গেল। বললে, বিপদ তোমার একার নয় সুমিত্রা। আমি নিজে চলতে শিখিনি, তোমাকে চালাব কেমন ক'রে?

চলতে যে শেখেনি সে বিয়ে করে কেন? মনে ছিল না তোমার, কত ধানে কত চা'ল?

শ্রীশের মেজাজটাও আজ ভালো ছিল না। সেও কস ক'রে

বললে, আমার ওপর দোষ চাপিয়ে তুমি পাশ কাটিয়ো না সুমিত্রা। তুমি আজকাল যে রকম কথা বলতে আরম্ভ করেছ এ কেবল মেয়েমানুষের পক্ষেই সম্ভব।

সুমিত্রা কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, তোমার ধমকটাও নূতন, এমন আমি আশা করিনি। এখন বুঝতে পাচ্ছি দূরের মাঠ দেখতেই ভালো, তার ওপর দিয়ে চলতে গেলে অনেক খানা খোন্দল।

আমারো সেই কথা মনে হচ্ছে। চোখে ছিল রঙীন চশমা, সেটা গেছে খসে। এখন ভাবছি ভালোবাসার মরণ ঘটে বিয়ে হ'লে। বিয়ের পর যেটা থাকে সেটা প্রেম নয়, তার নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া। বুঝতে পাচ্ছি ঠোকাঠুকি তোমার সঙ্গে চিরদিনই চলবে।

রাগে গস গস ক'রে সুমিত্রা বললে, আমার ত্রুটি যদি থাকে, তোমার গলদও কম নেই মনে রেখো!

শ্রীশ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, আছেই ত। এটা আগে চোখে পড়েনি যে, আমাদের মধ্যে ফাঁকি ছিল অনেক, অনেক ত্রুটি আর ভুল—জীবনের রূঢ় বাস্তবতার দিকটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল, কেবল স্বপ্ন গেঁথেছিলুম শূন্যে, তাই এত বড় ভুল ঘটল। তুমি দেখে নিয়ো সুমিত্রা, আমরা কোনোদিন শান্তি পাবোনা।

সুমিত্রা মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল। অত দর্শনতত্ত্ব তার সব সময় ভালো লাগে না।

এমন সময় নিচে মেয়েদের গলার আওয়াজ শোনা গেল। অণিমা আর মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে উপরে উঠছে। স্বামী স্ত্রী মিলে তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল।

*

*　*

ভবেশের কাছে তরুণী-সঙ্ঘের চাঁদা আদায় করতে শিবানীর দেরি হয়নি। সেদিন সকালবেলা শিবানী তাকে সঙ্গে ক'রে এনে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। চাঁদার পরিমাণ দেখে সবাই খুসি। যাবার সময় সে শিবানীকে তুলে নিলে মোটরে। তাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে এল।

বেলা ছুটোর সময় আবার ভবেশ মোটর নিয়ে এসে হাজির। হর্ণ বাজাতেই ছেলেমেয়েরা ছুটে এল। এবার সে সাহেব সেজে এসেছে। বললে, কে কে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে, হাত তোলো।

ছেলেমেয়েরা সবাই হাত তুললে, এবং আর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই সকলে গাড়িতে চড়ে বসল। ভবেশ বলে গেল, ঘণ্টা ছুই বাদে আবার এদের ফিরিয়ে দিয়ে যাব বৌদি।

তাই হোলো, বেলা চারটে নাগাৎ আবার সবাই ফিরে এল। কত ফুল, খেলনা, ছেলে-ভোলানা মোটর,জাপানী কাগজ,চকোলেট্ আর শিশুপাঠ্য বই তারা আনলে হাতে ক'রে। এবার শিবানীর পালা, কাপড় চোপড় প'রে সে প্রস্তুত হয়েই ছিল, ভবেশ তাকে তরুণী-সঙ্ঘে পৌছে দিয়ে চ'লে যাবে।

ভবেশ বললে, তুমি চলো বৌদি।

বৌদি বললেন, উনি যে বাড়ী নেই, ছেলেমেয়েদের একলা রেখে···আর গেলেই হোলো ত, বেশ ক'রে একদিন আমাকে ভাই বেড়িয়ে এনো। শিবু, রাত হয় না যেন ফিরতে।

ভবেশ নিজেই ড্রাইভ্ করবে। শিবানী বসল পাশে। ইতিমধ্যে তার লজ্জাটুকু গেছে ভেঙে, বেশ সহজ হয়েই সে বসল।

গাড়ী ছুটতে লাগল। বেপরোয়া, বেসামাল। গতি তার ভয়ানক দ্রুত। ভয় নেই, কেউ চাপা পড়বে গ্রাহ্য নেই, কোথায় চলেছে লক্ষ্য নেই। শিবানীর মাথার চুল বাতাসে বিস্রস্ত হয়ে গেল, বিপদের আশঙ্কায় সর্ব্বশরীর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হতে লাগল, দ্রুতগতির একটা অস্বাভাবিক নেশায় চোখ দুটো তার অল্পকালের মধ্যেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই মোটরের দুর্দ্দান্ত গতির মতোই এই লোকটার জীবন দুরন্ত। দুর্ব্বোধ্য এর চরিত্র, রহস্যময় এর গতিবিধি।

শিবানী ?

গলা পরিষ্কার ক'রে শিবানী বললে, উঁ ?

কেমন লাগছে ?

বেশ।

এখনই তোমাকে সঙ্ঘে পৌঁছে দেবো, না একটু বেড়িয়ে নেবে ? —ভবেশ বললে।

শিবানী বললে, বেড়িয়ে যেতে পারি। কিন্তু একটু আস্তে চালান্ ভবেশবাবু, বিপদ ঘটতে পারে।

আস্তে আমি চালাতে পারিনে শিবানী।

আবার কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ। হেলে-দুলে বেঁকে মোটরখানা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে। বুঝি বা কোন্ সর্ব্বনাশা মুহূর্ত্তে একটা বিপদ ঘ'টে বসে।

ভবেশ আবার ডাকলে, শিবানী?

কি বলচেন?

তোমাকে আমি কাঁধে নিয়ে ঘুরতুম, তুমি তখন এতটুকু। মনে নেই ত?

শিবানী বললে, না।

আমাকে মনে ছিল?

একটু একটু ছিল।

ভবেশ বললে, আমিও তোমাকে নতুন ক'রে দেখতে চাই শিবানী। এমন মেয়ে তুমি, বিয়ে ক'রে নষ্ট হয়ে যাবে? বিদ্রোহ করবে না? স্বাধীন বুদ্ধি নেই, স্বাধীন মন?

শিবানী দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে, কি করব ব'লে দিন্?

বলতে হবে না, নিজেই খুঁজে নাও। মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াও, প্রতিবাদ করো। নতুন পথ কাটো।

লোকটার ধারালো তীক্ষ্ণ কথার যন্ত্রণায় শিবানীর চোখ বুজে

এল। মনে হোলো, এ লোকটা তীরের ফলা দিয়ে তার বুকের ভিতর খুঁচিয়ে নিদ্রিত রক্তকে জাগিয়ে তুলছে। সে যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

বড় একটা রাস্তার উপর একটা হোটেলের সুমুখে এসে মোটরখানা ঝাঁকানি দিয়ে থাম্‌ল। দুজনে নামতেই চাপরাশি সেলাম ঠুকে স'রে দাঁড়াল। পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকে শিবানী দেখলে, জন চারেক ফিরিঙ্গী ও মেম হোটেলের একদিকে বিলিয়ার্ডস্‌ খেলছে। চারিদিকে কাঁচের আসবাব, সুন্দর রঙীন পানীয়, বিচিত্র আহার-সামগ্রী সুসজ্জিত, সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রী-পুরুষেরা এক একখানা টেবল্‌ নিয়ে বসে খানা খেতে খেতে বিশ্রম্ভালাপ করছে —বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর—সমস্ত মিলে শিবানীকে বিহ্বল ক'রে তুললে। হঠাৎ একটা নতুন পৃথিবী যেন তার চোখের সম্মুখে উঠে দাঁড়াল।

ভবেশ তার হাত ধ'রে একটা পার্টিশনের মধ্যে চেয়ার টেনে বসালে। নিজেও বসলে। বয় এসে একখানা 'মেনু' দিয়ে গেল। ভবেশ বললে, কি খাবে বল?

খাবার কথা শিবানী ভুলেই গেছে। এমন একটা বিস্ময়কর জায়গায় কি মানুষ খেতে আসে? সে বললে, কিছু খাবো না আমি ভবেশবাবু।

তাই কি হয়? আচ্ছা, আমিই অর্ডার দিচ্ছি।

অর্ডার মতো খাবার এল, পানীয় এল, পানাহার সম্বন্ধে ভবেশের বাদবিচার নেই। আহারাদি ক'রে দাম চুকিয়ে বকশিস্ দিয়ে আবার তারা বাইরে এসে মোটরে উঠ্‌ল।

পথ এবার বেশী দূর নয়, একটা সিনেমার কাছে গাড়ী এসে দাঁড়াল। শিবানীর আর কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই, নিষেধ নেই, অনিচ্ছা প্রকাশের কোনো সুযোগ এবং তাগিদ নেই, সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনে দুজনে ভিতরে ঢুক্‌ল। ছবি দেখানো সুরু হয়েছে। নিজের জায়গায় এসে তারা বস্‌ল। ভবেশের গ্রাহ্যও নেই, হুঁসও নেই—এ যেন তার খেলা, এই বেপরোয়া খেলায় সে চিরকাল অভ্যস্ত।

ছবি শিবানী আরো কয়েকবার দেখেছে কিন্তু এমন ক'রে সে আর কোনোদিন দেখেনি। এর ঘটনা, চরিত্র, তত্ত্ব, রস—সমস্তটা যেন তার রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল, পাথরের মতো নিশ্চল আর নিঃশব্দে সে ভবেশের একখানা হাত চেপে বসে রইল। তরঙ্গে তরঙ্গে সে যেন ভাসছে।

রাত নটা আন্দাজ সে বাড়ী ফিরলে। ভবেশ দরজা পর্য্যন্ত এল কিন্তু ভিতরে আর ঢুকল না, সময় নেই, তাকে আবার কোন্ এক পার্টিতে গিয়ে মিলতে হবে। শিবানীর হাতের উপর একটি চুম্বন দিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে মোটর নিয়ে চ'লে গেল।

ভিতরে গিয়ে দিদিকে খবর দিয়ে শিবানী উপরে উঠে এল। মাথাটা তখনো তার ঝিম ঝিম করছে। যেন দুরন্ত ঝড় বয়ে গেছে। বিছানায় গিয়ে সে শুয়ে পড়ল, মনের পুঁজি তার সমস্ত খরচ হয়ে গেছে। উৎসাহ নেই, উত্তেজনা নেই—শক্তিহীন অবসাদে শ্রান্ত ও ক্লান্ত। বিছানায় সে এলিয়ে পড়ল। সে যেন যুদ্ধ ক'রে ফিরেছে।

রাত্রে সে ঘুমোতে চেষ্টা করলে, কিন্তু চোখ বুজতে পারল না। সমস্ত শহরটা—হোটেল, সিনেমা, মোটরের পথ, আলো, বিগত কয়ঘণ্টার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন—সমস্তটা যেন তালগোল পাকিয়ে তার মাথার ভিতরে মাতামাতি ক'রে চলেছে। পরিশেষে তার হাতের উপরে লোকটার বিষাক্ত চুম্বন—বাধা দেবার সামর্থ্য ছিল না, সাহস ছিল না—হাতের উপরটা এখনো জ্বালা করছে। গত দিনের সঙ্গে আজকের দিনের কী প্রভেদ! আজ তার স্বভাবটা পর্য্যন্ত যেন বদলে গেছে, নিজেকে আর চেনবার উপায় নেই, প্রকাণ্ড একটা ধাক্কায় তার প্রাচীর চুরমার হয়ে গেল, বাইরের ঝড় যেন ভিতরে ঢুকে তাকে বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল আর ছন্নছাড়া ক'রে দিলে! গতদিনের শিবানী যেন সাগর তরঙ্গে ভেসে গেছে!

তিন চারদিন আর বিরাম রইল না। ধীরে সুস্থে ভাববার আর অবকাশ নেই, দিদি আর জামাইবাবুর অনুমতি নেবার সময়

নেই—শিবানীকে ছুটে চলে আসতে হয়। তরুণী-সঙ্ঘের কাজ পড়ে রইল, অণিমার দল তাকে ডাকাডাকি ক'রে ব্যর্থ হোলো, কেউ ক'রে গেল বিদ্রূপ, কেউ কটূক্তি—কিন্তু শিবানীর সময় নেই। একটা ভয়ানক নেশায় সে আত্মহারা। শুধু কেবল সেই নয়, ভবেশের চারিদিকে গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যাও অনেক। আজ-কাল তার এদিকের বন্ধু বান্ধবী ছাড়াও জেসফ্ কোম্পানীর একজন ফিরিঙ্গী যুবক ও গোটা দুই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে-টাইপিষ্ট্ জুটেছে। তাদের হাঁটতে বললে ছুটে চলে। শিবানী সকলের পিছনে পিছনে থাকে।

শিবানীর জামাইবাবু অঘোরনাথ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, এত বড় মেয়ের অবাধ স্বাধীনতা তিনি পছন্দ করেন না। সব পাত্রেই সকল বস্তু রাখা যায় না। মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু ছোট ভাইয়ের আওতা থেকে তাঁর এই সুশৃঙ্খল সংসারকে সামলাবার কথা ভাবতে লাগলেন।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, শিবানীর ফিরবার আর পথ নেই। ভবেশের সঙ্গে না বেরুলে তার দিন কাটতে চায় না। পথ, জনসমারোহ, মোটরের দ্রুতগতি, উগ্র আনন্দ, উজ্জ্বল জীবন স্রোত—এদের প্রতি তার ভয়ানক মোহ ধরেছে। এই লোকটার প্রচণ্ড আকর্ষণ সোণার হরিণের মতো তাকে টেনে নিয়ে যায়। এই স্বপ্নপুরুষকে দেখলে তার ভয় করে, গা কাঁপে, চোখে অন্ধকার

নেমে আসে কিন্তু ছাড়াবার উপায় নেই, পালাবার পথ নেই। নদীর উন্মত্ত স্রোতে সে ভেসেছে, ভেসে যাওয়া ভিন্ন পরিত্রাণ নেই। নিজের অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে চলন্ত মোটরে ব'সে পিছন দিকে তার মাথাটা হেলে পড়ে।

শিবানী ?

শিবানী মুখ তুললে। গিয়ার-হুইল্‌টা ঘুরিয়ে ভবেশ হেসে বললে, দাদা বৌদি—ওঁরা রাগ করেছেন, না ?

হুঁ।

এ অতি সত্য কথা শিবানী, ওদের দোষ নেই। আমার এ দুর্দান্ত জীবন, এ ওদের সইবে কেন ?

শিবানী চুপ ক'রে ভবেশের মুখের দিকে তাকালে।

কিন্তু আমি তোমারই আশা করি শিবানী !

কি আশা করেন বলুন ?

আশা করি, তুমি বড় হবে। মানুষ হয়েও তুমি মানুষকে ছাড়িয়ে যাবে।

শিবানী একপ্রকার হাসি হাসলে, যার রহস্য ভবেশের বোধগম্য হোলো না। গাড়ী ছুটতে লাগল। এত তার দ্রুত গতি, কিন্তু শিবানী আর ভয় পায় না। আবেশে তার চোখ বুজে আসে।

সেদিনও একটা হোটেলে গিয়ে দুজনে ডিনার খেতে বসল। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ভিতরে মহাসমারোহে তখন

জাজ মিউজিক সুরু হয়েছে। বিলোল বিস্রস্ত আনন্দ, চারিদিকে প্রখর আলো, কাঁচের গ্লাসের আওয়াজ, পোষাক পরিচ্ছদের চমকপ্রদ পারিপাট্য, টাকার ঝনঝনানি, সোডার বোতলের শব্দ, কলহাস্য, ইসারা ও ইঙ্গিত—এবং তাদেরই মাঝখানে জোড়া জোড়া স্ত্রী-পুরুষের বল্‌নাচ। নাচের তালে তালে বাজনা বাজছে। মানুষের নিদ্রিত, গুপ্ত যৌবন-লালসাকে উন্মত্ত নেশায় খুঁচিয়ে জাগানই তাদের কাজ। শিবানীর গলা জড়িয়ে ভবেশ তাকে কয়েকটা নিবিড় চুম্বনে প্লাবিত ক'রে দিলে। শিবানীর চোখ বন্ধ হয়ে এল।

তারপর দিন-চারেক আর ভবেশের দেখা নাই। একবার দূরে গেলে তাকে ফিরে পাওয়া বড় কঠিন। শিবানী বাড়ীর মধ্যে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগল। সমস্ত দিনমানের অশান্তি, সমস্ত দীর্ঘ রজনীর অস্বস্তি। সংসারের কাজ তার ভালো লাগেনা, পরম আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে সে প্রহরের পর প্রহর গুণতে লাগল।

বাঘিনী স্বাদ পেয়েছে রক্তের। তার ব্যাকুল দৃষ্টি চক্ষু বিশাল রাজধানীর লোককোলাহলের আনাচে কানাচে ভবেশকে খুঁজে বেড়াতে লাগল হায়রাণ হয়ে। চঞ্চল রক্তে ধরেছে আগুনের নেশা, অপরিণামদর্শী উচ্চ আশা শিরায় শিরায় রঙীন মদের মতো প্রবাহিত

হচ্ছে, বিহ্বল ক'রে তুলছে তাকে। কিন্তু এই লোকটা, এই দায়িত্বজ্ঞানহীন ভবেশ, তাকে তার শান্ত আশ্রয় থেকে শ্যেনপক্ষীর মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, মারবে কি রাখবে তার ঠিকানা নেই।

কী যন্ত্রণাময় প্রতীক্ষা! মুহূর্ত্তের পর আর মুহূর্ত্ত কাটতে চায় না। সমগ্র পৃথিবী রুদ্ধ নিশ্বাসে তার পথের দিকে চেয়ে রয়েছে। এ শিবানীর কি হোলো? অন্তরে বিপ্লব উঠ্‌ল মেতে, সামলাবে কেমন ক'রে? পারিবারিক জীবনের ছন্দকে ডিঙিয়ে যে-জগতে সে লাফিয়ে পড়েছে, এখান থেকে ফিরবার ত আর পথ নেই। সে ত বেশ ছিল! সুন্দর শান্ত জীবন, ভবিষ্যৎ জীবনের সুখকল্পনা, তরুণী-সঙ্ঘের কাজ, অবসর সময়ে লঘু সাহিত্য পড়ার আনন্দ, সকলের স্নেহের পাত্রী হয়ে থেকে গৌরব গর্ব্ব—এমন কাম্য জীবন তার হারালো কেমন ক'রে? ক্ষণমাত্র খেলার পর যার যাবার সময় হয়, সেই ক্ষণিকের অতিথিকে সে আগে চিন্‌তে পারে নি কেন?

বাড়ীর মধ্যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হাওয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, এ-বাড়ীতে ভবেশের আর স্থান নেই। সে মানুষের সমাজের অনভিপ্রেত ধাতু দিয়ে গড়া, সে অসহনীয়। তাকে নিয়ে গল্প করা চলে, ঘর করা চলেনা। আপন বাসস্থানে আগুন লাগানোই তার কাজ। সেজন্য জীবনে তার আশ্রয় জোটেনি, বন্ধনহীনতাই তার স্বভাব ধর্ম্ম।

কিন্তু হোক সে অভিশপ্ত, পরিণামচিন্তাহীন, তবু তার অভাবে শিবানীর চলবে না। যে উজ্জ্বল জীবনের সম্ভাবনার কথা সে শুনেছে, তার একটা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ও লোকটার নিকট থেকে বুঝে নিতে হবে। ওর ছায়া, ওর আশ্রয়, ওর প্রভাব আর পরিবেশ— এদের অবহেলায় ত্যাগ ক'রে শিবানী পথের কাঙাল হতে চায় না। ওর কাছে আছে শিবানীর উন্নতির গোপন তত্ত্ব।

বাড়ীর একটা শাসন তার উপরে উদ্যত হয়ে ছিল, বিনা অনুমতিতে পথে যাওয়া আর চলবে না। তবু একদিন শিবানী বেরিয়ে পড়ল, শাসন সে মানবে না। পিছনের সমাজের বন্ধন. ছিঁড়ে তাকে বিদ্রোহ ক'রে বড় হতে হবে, আত্মোপলব্ধি ক'রে হবে আত্মপ্রকাশ। বড় রাস্তাটা ধরে চলতে লাগল সে দ্রুতপদে। বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ। হাঁটা পথ সে বেশি জানে না, মোটরের পথটা তার মনে আছে। সাহস ক'রে একখানা ট্যাক্সি ডেকে চ'ড়ে বসল। কাপড়ের তলা থেকে জামাইবাবুর মণিব্যাগটা বের ক'রে দেখলে, অনায়াসে সে গোটাকতক টাকা এখনই খরচ করতে পারে। খরচে তার বড় আনন্দ।

ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড়ে নেমে সে গাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিলে। চলতে লাগল বাঁ হাতি। শত সহস্র লুব্ধ চক্ষের দৃষ্টি তার দিকে। আবার ফিরল বাঁ হাতি। ভয় আর সঙ্কোচ ছিল মনে, কিন্তু তার পাশেই ছিল উল্লাস। এমন একাকিনী আর

কোনোদিন নিজের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি। কত রাস্তা, দোকান, হোটেল ও সিনেমা সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মুখ রাঙা, চকিত চোখ, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত—এবার সে চারিদিকে চেয়ে ভীত হয়ে উঠ্‌ল। এই জনারণ্য ও অট্টালিকার জটলা, এদিকে কোথায় সে খুঁজে পাবে তার নিষ্ঠুর পলাতককে? পা দুটো ক্লান্ত হোলো, ফুরোলো উৎসাহ—এবার ত তাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে! কিন্তু এই মণিব্যাগ না ব'লে আনার কৈফিয়ৎ কি? অন্তঃপুরের মেয়ে সে, ভদ্রকন্যা—কি বলবে সে জামাইবাবুকে? পা তার কাঁপতে লাগল।

হ্যালো শিবানী?

শিবানী মুখ ফিরিয়ে উন্মাদিনীর মতো ভবেশের হাত চেপে ধরল। মুখ থেকে তার একটা শব্দ বেরিয়ে গেল।

এখানে দাঁড়িয়ে? এসো, এই আমার হোটেল।

শিবানী রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, কত খুঁজছি আপনাকে। আপনি—আপনি ছিলেন কোথায়?

ভবেশ তার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বললে, ওপরে চলো।

তার পিছনে পিছনে একটি পরমাসুন্দরী ইংরাজ যুবতী হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল। শিবানী দেখলে তাকে, সে লক্ষ্য করলে শিবানীকে। ভবেশ তাদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলে।

তিনজনে লিফ্‌টে চ'ড়ে উঠ্‌ল তেতালায়। ঘরে ঢুকে যুবতীটি হেসে শিবানীকে একটা চেয়ারে বসালে এবং ইংরেজিতে বললে, দুষ্ট লোকটি তোমার বন্ধু বুঝি ?

শিবানী লজ্জায় মাথা হেঁট করলে।

মেয়েটি আবার হেসে বললে, তোমার দুর্ভাগ্য !

ভবেশ ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে একটা নতুন স্যুট্ প'রে এল। তারপর বললে, জিনিস-পত্র একটু পরে যাবে, কি বলো মলি ?

মলি বললে, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চলো। It is getting nearly three thirty.

ভবেশ বললে, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ? ভালই হয়েছে।

শিবানী শুষ্ক কণ্ঠে বললে, আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

আমরা এখন যাবো এরোপ্লেনে কলম্বো, তারপর সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে—

মলি বললে, তুমি যাবে ?

শিবানী কথা বলবার সময় পেলে না। ছোট একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে মলির হাত ধ'রে ভবেশ আবার নীচে নেমে এল। শিবানী এল পিছনে পিছনে।

হেসে কৌতুক ক'রে ঠেলাঠেলি ক'রে যখন ভবেশ মোটরে

উঠে মলির পাশে গিয়ে বসল, তখন হঠাৎ শিবানী বললে, কবে ফিরবেন, বললেন না ত ?

ভবেশ মুখ বাড়িয়ে হেসে বললে, ঠিক বলতে পারি নে। দাদা আর বৌদিকে প্রণাম দিয়ো শিবানী।

আর একটি কথাও বলবার সময় পাওয়া গেল না। মলির ইঙ্গিতে হুস ক'রে মোটরখানা ছুটে বেরিয়ে গেল।

দূরে মিলিয়ে গেল মোটরখানা ধূলোয় অস্পষ্ট হয়ে। তপোবনের হরিণীর বুকে তীরের ফলা বিঁধে রেখে পালিয়ে গেল রাজার দুলাল। শিবানীর নড়বার শক্তি রইল না। মোটরের শব্দ, ট্রামের ঘর্ঘর আওয়াজ, পথের গোলমাল, অসংখ্য মানুষের আনাগোনা— এদেরই একান্তে দাঁড়িয়ে নিরুপায় ও সর্ব্বস্বান্ত মেয়েটির দুই চোখ দিয়ে টস টস ক'রে অশ্রু নেমে এল।

*

* *

তরুণী-সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে বিজয়া সোজা বাড়ী এসে পৌছল। স্বামী এখনো এসে পৌছন নি, ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। অপরাহ্লের রোদ ম্লান হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকে দেখা গেল মাষ্টারমশাই বসে রয়েছেন। বিজয়া বললে, আপনি আমার চিঠি পেয়েছেন কাকাবাবু?

মাষ্টারমশাই বললেন, হ্যাঁ মা, চাকরের হাতে। আর শুনেছ বিজয়া, মৃণালের বিয়েতে একেবারেই মত নেই?

ও একটা পাগল কাকাবাবু, মত ওর কোনোদিনই নেই।

থাকলেই কিন্তু ভালো হোতো বিজয়া, আমি ছুটি পেতাম।

বিজয়া বললে, আজ সকালেও আমার কাছে এসেছিল, আবার আসবে বলে গেছে।—এই ব'লে সে মাষ্টারমশায়ের কাছে এসে বসল।

যে চেহারা আমি তার দেখলাম তাতে তুমিও অবাক হয়ে যেতে বিজয়া। মেয়েদের মনের বাঁধন পুরুষের চেয়ে অনেক কঠিন। বিয়ের কথাটা সে হেসে অস্বীকার ক'রে দিল। আচ্ছা, মৃণালের আসল কথাটা কি বলো ত? এখনকার শিক্ষিত মেয়েরা কি বিয়েটাকে উড়িয়ে দিতে চায়?

মোটেই না কাকাবাবু।—বলে বিজয়া মাথা হেঁট ক'রে রইল।

শুনতে পাই বিয়ের আগেই অনেক মেয়ের সঙ্গে অনেক ছেলের ভাব হয়, ওই তোমরা যাকে বলো ভালোবাসা, এরকম একটা কিছু ঘটনা মৃণাল ঘটায় নি ত?—ব'লে মাষ্টারমশাই হাসতে লাগলেন—মৃণালের চেহারা দেখে আমি নিজের মতামত একটু বদলেছি বিজয়া, ও মেয়েটি শতকরা নিরেনব্বই জন মেয়ের মধ্যে পড়ে না।

বিজয়া বললে, মৃণাল আমাকে সব কথা বলেছে কাকাবাবু, কিন্তু আপনার কাছে প্রকাশ করা বড় কঠিন।

তা হোলে বোলো না মা, সব কথাই শুনতে নেই, মেয়েমানুষের মনের কথা অতি নিকট আত্মীয়ের কাছেও প্রকাশ করা চলে না।

কিন্তু আপনার কাছে বলতেই হবে যে কাকাবাবু।

আমার কাছে? কেন মা?

বিজয়া বললে, যে কথাটা অনেকদিন মৃণাল আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারে নি সে আপনাকে শুনতেই হবে, এই তার অনুরোধ, এই তার দাবি। কী অবস্থায় পড়লে যে মেয়েমানুষের মুখ ফোটে তা আপনি জানেন কাকাবাবু।

কী সে, বলো ত মা?

মৃণালের বিয়ে হয়ে গেছে।

মাষ্টারমশাই সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালেন। বললেন, ও, তাই নাকি? বেশ, বেশ।

কা'র সঙ্গে হয়েছে তাও আপনাকে শুনতে হবে কাকাবাবু।

মাষ্টারমশাই বললেন, নিশ্চয় শুনব। স্বামী-স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করতে হবে যে, বলো।

এবারে রুদ্ধ নিশ্বাসে বিজয়া বললে, আপনিই তার স্বামী, কাকাবাবু।

নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মাষ্টারমশাই বললেন, আমি? হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। মেয়েরা দেখছি সাহিত্যের খোরাক হয়ে উঠল। মাথার যে দিকটায় চুল পেকেছে তার ওপর একটু কলপ দিয়ে আসি, কি বলো মা?

বিজয়ার বুকের ভিতর টিপ টিপ করছিল, কথা বললে না। মাষ্টারমশাই বললেন, মা লক্ষ্মী, চুপ ক'রে রইলে যে? এ রকম ছেলেমানুষী কি তোমাকে মানায়?

আমি ছেলেমানুষী করি নি কাকাবাবু, মৃণাল মনে মনে অনেক দিন থেকে আপনাকে—

মনে, মনে, মৃণাল, আমাকে—আবার উচ্চকণ্ঠে তিনি হেসে উঠলেন, এবং হাসি থামবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, মৃণাল নিঃশব্দে ঢুকছে ঘরে।

ভিতরের হাওয়াটা যেন থম থম ক'রে উঠ্‌ল। মাষ্টারমশাই প্রথমেই কথা বললেন, মৃণাল, তুমি ত একটি অদ্ভুত স্বামী নির্ব্বাচন করেছ দেখছি! একেবারে মৌলিক আবিষ্কার! তোমাদের তরুণী-সঙ্ঘটা কি রসচক্র? ইতিহাসের সংযুক্তাও তোমার কাছে হার মানলেন। বেশ নতুন ঘটনা, কাগজে ছাপিয়ে দেবো নাকি?—সকৌতুকে তিনি হাসতে লাগলেন।

কেউ কোনো কথা বললে না, তিনি বলতে লাগলেন, ভাগ্যি ছোট ছেলেমেয়েরা এদিকে কেউ নেই, এমন একটা মজার গল্প শুনলে তারা—

মৃণাল নতমস্তকে বললে, আপনি হয়ত আমাকে ঘৃণা করবেন এরপর।

ঘৃণা? তোমাকে? কী আশ্চর্য্য!

বিজয়া উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাষ্টারমশায় বললেন, গল্প শুনতে বেশ আমোদ লাগে, এরকম আজগুবি কল্পনা কবে তোমার মাথায় ঢুক্‌ল মৃণাল? প্রথম দর্শনেই নিশ্চয় নয়!

আপনার বিদ্রূপ আমার লাগবে না, আমি জানি আমি কী করেছি।

মাষ্টারমশায় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, জীবনে চমকপ্রদ কল্পনাকে ঠাঁই দিয়ো না মৃণাল, তোমার এখনো অনেক বাকি। আজ আমার সমস্তটা মনে পড়ছে, ঠিক কথাটা

আগে বুঝতে পারলে তোমাকে পূর্ব্বেই সাবধান ক'রে দিতাম—এরকম ছেলেমানুষী করো না মৃণাল। তোমার এই পরিহাস আমার সয়ে যাবে জানি কিন্তু তুমি নিজের মাথায় এমন ক'রে অভিশাপ নামিয়ে এনো না। ছি ছি, তোমরা আমার স্নেহের বস্তু, এমন ক'রে আমাকে লজ্জা দিয়ো না।

মৃণাল বললে, আমি জানি আপনি এমনি করেই আমাকে বলবেন।

এর চেয়েও বেশি ক'রে বলব যদি দরকার হয়। আশাকরি দরকার হবে না, তার আগেই তুমি নিজের ভুল শোধরাতে পারবে। তুমি দুটো তিনটে পাশ করেছ, নিজের কথাও তুমি ভাবতে শিখেছ—এ সব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া কি ভালো মৃণাল? হ্যাঁ, ভালো কথা, আর কোথাও যেন একথা প্রচার না হয়, ইতিমধ্যে ওই পাত্রটির সঙ্গে সব পাকা ক'রে ফেলি, তুমি যেন বাধা দিয়ো না।

মৃণাল মৃদুকণ্ঠে বললে, আমাকে এমন ক'রে অপমান করবেন না।

অপমান ত তোমাকে করি নি!

বিয়ের চেষ্টা করা মানেই তাই, হিন্দুর মেয়েকে কি আপনি দ্বিচারিণী হতে বলেন? আমি কি এতই হেয় আপনার চোখে?—বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা এইবার মৃণালের গাল বেয়ে নেমে এল।

মাষ্টারমশায়ের দম আটকে এসেছিল। যে-মেয়ে ছিল তাঁর কর্ম্মময় জীবনে একান্তে, আজ সেই যেন দুরন্ত ঝড়ের মতো প্রবল হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বিদেশ যাবার সময় তুমি এরকম ব্যবহার না করলেই ভালো করতে মৃণাল।

সাশ্রুনেত্রে মৃণাল বললে, কবে যাবেন বিদেশে ?

কাল কিম্বা পরশু, যাবো হরিদ্বারে, অনেকদিনের জন্যে।

আমিও যাবো আপনার সঙ্গে ?

আমার সঙ্গে ? তুমি ? তার চেয়ে আত্মহত্যা করো মৃণাল।—ব'লে মাষ্টারমশায় উঠে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

নিচে বাইরের ঘরের কাছে বিজয়া দাঁড়িয়েছিল, মাষ্টার-মশায়কে বেরিয়ে আসতে দেখে সে বললে, আমি পড়েছি বিপদে কাকাবাবু, কি করি আমাকে ব'লে দিন্।

কেন মা ?—মাষ্টারমশায় দাঁড়ালেন স্থির হয়ে।

একথা এতটুকু মিথ্যে নয়, আপনি ছাড়া মৃণালের আর কেউ নেই। এমন মেয়ে আজকাল হয় না। আপনার জীবনের সঙ্গে ও নিজেকে একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে বসে রয়েছে, আপনার উপযুক্ত হয়ে ওঠাই ওর সব চেয়ে বড় সাধনা। কী ভালই ও বাসে আপনাকে।

এ আমার শাস্তি বিজয়া —ব'লে মাষ্টারমশায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

কেমন ক'রে পথ দিয়ে চললেন, কত লোকের পাশ কাটিয়ে, কত মোড় ঘুরে, কখন্ এসে পৌছুলেন বাড়ীতে, ঘরে ঢুকে কেমন ক'রে আলো জ্বাললেন—এসব তাঁর কিছুই মনে নেই। ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তিনি একটা গভীর নিশ্বাস ফেললেন। ঘরটা যেন তাঁর চোখের উপর দুল্‌ছে।

কতক্ষণ বসেছিলেন কে জানে, পায়ের শব্দে তাঁর চমক ভাঙল। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, মৃণাল এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। হঠাৎ বুঝতে পারলেন না, তিনি কি করবেন। ধৈর্য্য হারালেন না, কিন্তু সোজা হয়ে বসে বললেন, আবার এসেছ যে?

মৃণাল বললে, হ্যাঁ, এসে ত অন্যায় করি নি।

কেন এলে বলো ত?

বলতে এলাম, আপনার কোথাও যাওয়া হবে না।—ব'লে মৃণাল কাছে এসে দাঁড়াল।

মাষ্টারমশায় বললেন, তুমি কি আমাকে বেঁধে রাখতে চাও মৃণাল?

যেতে আমি দেবো না আপনাকে।

তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট দৃঢ়তা, গভীর আত্মপ্রত্যয়। মাষ্টারমশায় হাসলেন, বললেন, আমার মনেও বন্ধন নেই, বাইরেও বন্ধন নেই, তা জানো তঁ মৃণাল?

মৃণাল বললে, আমার মনের কথা শুনে নিয়ে আমাকে আপনি

অশ্রদ্ধা ক'রে চলে যাবেন, এ আমার সইবে না। আপনার কোথাও যাওয়া অসম্ভব।

তুমি যাও, যাও মৃণাল—ব'লে মাষ্টারমশায় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, তুমি আজ চ'লে যাও, বাঁচাও আমাকে।—থর থর ক'রে কাঁপছিল তাঁর সর্ব্বশরীর।

মৃণাল এক পাও নড়ল না, মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে বললে, আপনাকে বাঁচাবো কিন্তু আমি যাবো কোথায়? আমি কোথাও যাবো না, এই পায়ে আমার জায়গা!

এ কি বিপদ মৃণাল? পা ছাড়ো। এমন নাটকের জন্যে আমি প্রস্তুত নই। তুমি যখন এসে পৌঁছলে তখন আমার জীবনে বেজে উঠেছে ধ্বংসের বাজনা। যাও তুমি।

মৃণাল উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে বললে, এখন যাচ্ছি কিন্তু জানবেন কোথাও আপনাকে আমি যেতে দেবো না। আমাকে ছেড়ে যাবার শক্তি আপনার নেই।—ব'লে সে বেরিয়ে চ'লে গেল।

•

তৃতীয় দিন দুপুরবেলায় মাষ্টারমশায় তাঁর ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠায় লিখছিলেন। দরজাটা বন্ধ।

'একে তুমি কি বলবে বিজয়া? কি আখ্যা দেবে? চিরকাল দারিদ্র্য ছিল, মরবার সময় পেলুম ঐশ্বর্য্য। কিন্তু আমার নিজের

কথাটাই যে বড় এখানে। চল্লিশ পার হয়ে পঞ্চাশের দিকে চলেছি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, পথ আর বাকি নেই। আমার সমস্ত আয়ুটা কেটে গেল উপবাসে। কী দিতে পারি মৃণালকে? কি আছে আমার? সে এল মৃত্যুর মতো, নিয়তির মতো।'

আবার তিনি লিখতে লাগলেন, 'কোথায় গেল আমার বাইশ বছরের তারুণ্য? কোথায় গেল পঁচিশ বছরের যৌবন! আমার বুকে ছিল অনন্ত আশা, অপরিমেয় প্রেম, সে-জীবন আমার কোথায় গেল? এই মৃণালের পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে ছিলাম, মৃণাল আসে নি।

'কিছু মনে ক'রো না তোমরা। এ জন্মের মতো আমি অপারগ। আবার ফিরে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে চিনে নেবো মৃণালকে। সেদিন থাকবে নতুন জীবন, নতুন দেহ আর নতুন হৃদয়। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে গেছে, সে আমার যৌবনকাল। শ্মশানের ওপর কি কেউ বাসা বাঁধে না?

'শেষের দিকটা সংক্ষেপ করব। তোমার হাতে যখন এই ডায়েরী পড়বে তখন আমি অনেক দূরে। আর ফিরব না কোনোদিন, কারণ মৃণালের সঙ্গে আর আমার দেখা হওয়া সঙ্গত নয়। সে যেন আমাকে ক্ষমা করে। এই ডায়েরীর পাতাতেই তোমাদের জন্ত শেষ আশীর্ব্বাদ রেখে গেলাম। ইতি—তোমার কাকাবাবু।

*

* *

তরুণী-সঙ্ঘের সভা যখন ভাঙল তখন কিছু রাত হয়েছে। কেউ হেঁটে যাবেন, কেউ বা যাবেন গাড়ীতে। যাঁদের স্বামীরা এসে বাইরে অপেক্ষা করছেন তাঁদের আছে মোটর; যাঁরা কুমারী তাঁদের পৌছে দেবার জন্য ভৃত্য মোতায়েন রয়েছে। ভৃত্য সঙ্গে নেই এমন মেয়েও অনেক আছেন, তাঁদের পৌছে দেবার ভার ললিতার উপরে। বাস্তবিক, আয়োজন ক'রে মেয়েদের আনা এবং যথাস্থানে পৌছে দেবার মধ্যে রয়েছে তাঁদের একটি অসহায়তা; তখন মনে হয় তাঁরা মানুষ নন্, বোঝা। যাক্ সে অপ্রিয় মন্তব্য। ললিতা হাসতে হাসতে বললে, আসুন আপনারা।

অণিমা বললে, তুই ফিরবি কেমন ক'রে?

একাই ফিরব দিদি।

একা?

মৈত্রেয়ী বললে, গুণ্ডারা যদি পিছু নেয়?

মন্দ কি, চাকরের কাজ ক'রে দেবে!

তারপরের মন্তব্যটা শ্রবণযোগ্য নয়। মেয়েরা হাসলে, হাসলে অণিমা। ললিতা বললে, তবে বাবার মোটরটা বার করতে হয়।

এমন সময় একটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবক দরজার কাছে এসে

দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে অণিমা বললে, আরে, রূপেনবাবু যে। আসুন। প্রভাকে নিতে এলেন বুঝি?

ছোট একটি নমস্কার বিনিময় ক'রে রূপেন হেসে বললে, প্রভা ত আর দাদার তোয়াক্কা রাখে না, আমি এসেছিলুম আপনাদের এই ব্যাপারটা উঁকি মেরে দেখে যেতে।

দেখে কি মনে হচ্ছে?

ওপরটা ত ভালই লাগছে। কাজ হোক চাই না হোক, আন্দোলনটারও দাম কম নয়।

মৈত্রেয়ী হেসে বললে, পুরুষের সাহায্য কিন্তু আমরা নেবো না রূপেনবাবু।

প্রভা এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়াল। রূপেন বললে, তাতে পুরুষের ঝঞ্ঝাট কমবে, তাদের অনেক কাজ।

অণিমা বললে, এক জায়গায় কিন্তু আপনাদের বাদ দেওয়া চলবে না। ডোনেশনটা আদায় করতে একদিন যাচ্ছি আপনাদের ওখানে।

মৈত্রেয়ী বললে, সেদিন এসে মিটিংয়ের আইটেমগুলো সাজিয়ে দেবার কথা ছিল, আপনারা এলেন না কেন?

রূপেন বললে, আমার সাহায্যটা যে পুরুষের।

আপনি কি বাইরের লোকের মতনই ব্যবহার করবেন?—মৈত্রেয়ী বললে।

ভেতরের লোক আমি, এমন প্রমাণ ত এখনো পাই নি !

সবাই সকৌতুক আনন্দে হেসে উঠ্‌ল। বিদ্রূপের খোঁচা নেই, এমন নির্ম্মল পরিহাস মেয়েদের বড় প্রিয়। অণিমা অলক্ষ্যে একবার তাকাল মৈত্রেয়ীর দিকে। রূপেনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই মৈত্রেয়ীর মুখের উপর আলো জ্ব'লে ওঠে। এটা অণিমার পছন্দ নয়।

রূপেন বললে, আপনাদের মিটিংয়ের কি সাবজেক্ট্‌ ছিল আজ ?

মৈত্রেয়ী বললে, আমাদের সঙ্ঘের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকবে কিনা, এই আলোচনা হচ্ছিল।

কি ঠিক হোলো ?

অণিমা বললে, রাজনীতিটা বাদ দেবো। তবে যদি কেউ বিশেষ কারণে ব্যক্তিগতভাবে পলিটিক্‌সে নামে, তবে সঙ্ঘ তাকে বাধা দেবে না।

পরের দিন বিকালে আবার সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশন। সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খোলবার আয়োজন চলছে। সেদিন কলেজের ছুটি। নন্দরাণী দুপুর থেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছু একটা কাজের মধ্যে নিজের উদ্যমকে ঢেলে দিতে না পারলে তার আর স্বস্তি নেই। হাতের কাছে ছিল একখানা ইংরেজি

সংবাদপত্র। সেখানা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল আজ শহরের উত্তরাংশে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়েছে। সভাপতি হবেন দেশবীর হরিহর নাগ। কাগজখানা রেখে নন্দরাণী উঠে দাঁড়াল। এমন ছুটির দিনটাকে সে কোনোমতেই ব্যর্থ হতে দেবে না।

ঘণ্টাখানেক আগে থাকতেই সে বেরিয়ে পড়ল। উত্তর দিকের পথ ধ'রে বাস-এ চড়ে কিছুদূর যেতেই দেখা গেল, 'বিরাট সভার' আয়োজনটা সামান্য নয়। খুসি হয়ে নন্দরাণী সেই দিকে চল্‌ল।

পার্কের কাছাকাছি এসে সে দেখলে, ইতিমধ্যেই লোকে লোকারণ্য। হরিহর নাগের বক্তৃতা সুতরাং বেলা ঢুটো থেকে কাতারে কাতারে স্ত্রী পুরুষ। পার্কের চারিদিকে পুলিশ মোতায়েন হয়েছে, পতাকা হাতে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের দল, অভ্যর্থনা সমিতির লোকজনের ছুটোছুটি। মাঝখানে একটা মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে, তার আশে পাশে পতাকার উপরে নানারূপ শ্লোগান্ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মাঝে মাঝে বিদীর্ণ জনকণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' তরঙ্গিত হয়ে উঠছিল।

হরিহর নাগের বক্তৃতা হবে। যে হরিহর নাগ দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছেন, যাঁর ত্যাগ বাংলাদেশের একটা উদাহরণ স্থল, যিনি হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন অসংখ্যবার—সেই হরিহর নাগের বক্তৃতা।

দূর দূরান্তর থেকে দেবদর্শনার্থী নরনারীর সমাগম হয়েছে। আশ্চর্য্য হরিহর নাগের জনপ্রিয়তা, পার্কে তিলধারণের আর ঠাঁই নেই। উত্তেজনায় উল্লাসে আবেগে সকলেই অধীর উৎসুক— আজ হরিহর নাগের দর্শন পাওয়া যাবে। মোটরের শব্দ, বন্দে মাতরমের তরঙ্গ, অশ্বরোহী পুলিশের ছুটোছুটি, সার্জ্জেণ্টের লাঠি, স্বেচ্ছাসেবকের জটলা—এদেরই মাঝখান দিয়ে আসবেন হরিহর নাগ। ধন্য, ধন্য হরিহর নাগ!

দেশ সেবিকাগণের ব্যস্ততার আর অন্ত নেই—অগণ্য অসংখ্য অসূর্য্যম্পশ্যার ভিড় হয়েছে। বিখ্যাত নেত্রীস্থানীয় যাঁরা, তাঁরা আছেন পুরোভাগে। হরিহর নাগ তাঁদের নিকট দেবতা। দেবতার পূজার উপকরণস্বরূপ তাঁরা যেন পুষ্পস্তবকের মতো এই উদ্যানের পুষ্পপাত্রে সুসজ্জিত হয়ে বসেছেন। নানা বর্ণচ্ছটায় বিচিত্র সমাবেশ। ধন্য, ধন্য হরিহর নাগ।

অকস্মাৎ জনসভা স্তব্ধ হোলো। হরিহর নাগ মণ্ডপের উপরে উঠেছেন, এবার তিনি বাণী উচ্চারণ করবেন। স্তব্ধ, প্রশান্ত জনসাধারণ, অচপল, উদ্বিগ্ন। পক্কশ্মশ্রু, বিরাটমূর্ত্তি হরিহর নাগ বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ঋষির মতো রূপবান, উজ্জ্বল। সাহসিকতায়, বিক্রমে, ওজঃশক্তিতে ও ত্যাগে তিনি জনগণের প্রাণপ্রিয়।

মেয়েরা আনন্দোজ্জ্বল অপলক চক্ষে তাদের দেবতার দিকে চেয়ে

রইল। হরিহর নাগ হস্ত প্রসারিত ক'রে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। তিনি যেন বিধাতার আশীর্ব্বাণী বহন ক'রে এনেছেন। মুখের কাছে তাঁর লাউড-স্পীকার বসানো। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের বক্তৃতা অতি সহজেই সেই বিপুল জনসাধারণের কানে ধ্বনিত হতে লাগল।—

'দেশের নারীগণকে আজ অসীম উৎসাহে জেগে উঠতে হবে। সমাজের দুর্গম অন্ধকারের ভিতর থেকে বন্ধনজাল ছিন্ন ক'রে ছুটে আসতে হবে মেয়েদের। পুরুষের পাশবিক শক্তির কাছে তারা চির অবনত, চির শৃঙ্খলিত। হে মাতা, হে ভগ্নি, শক্তির অধিকারিণী তোমরা, দাঁড়াও নিজের পায়ে, তুচ্ছ করে দাও যত শাস্ত্র আর আচারের বন্ধন, দাঁড়াও ওঠো সমাজের নাগপাশ ছিঁড়ে, ধর্ম্মধ্বজীর অনুশাসন অস্বীকার ক'রে ছুটে যাও সব দিকে দিকে, বিরুদ্ধবাদীর কণ্ঠরোধ ক'রে দাও—' করতালির শব্দে গগন পবন মুখরিত হোলো। অস্থির চাঞ্চল্য মেয়েরা আনন্দধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল। বর্ত্তমান যুগের আত্মার বাণী হরিহর নাগ প্রকাশ করেছেন।

'হে পদদলিতার দল, আলোকের পথ তোমরা খুঁজে বা'র করো, স্বাস্থ্য ও শক্তিতে তোমরা উজ্জীবীত হয়ে ওঠো, মুক্ত পক্ষ বিস্তার ক'রে দিগন্তের প্রতি প্রান্তে স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমরা উড়ে চলো, শেষ ক'রে দাও পুরুষের দাসীবৃত্তি—'

আবার উন্মত্ত করতালির শব্দে কর্ণ বধির হয়ে এল।

সভাশেষে হরিহর নাগের পদধূলির নেবার জন্য মেয়েদের মধ্যে

হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। হরিহর নাগ নির্লিপ্ত উদার দৃষ্টিতে সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন। এত নির্লিপ্ত বলেই তিনি এত পূজা পান্।

তাঁর জন্য মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ভক্তগণের ঠেলা-ঠেলির ভিতর দিয়ে মোটরে উঠে তিনি যখন বসলেন, কোথা থেকে তাঁর সঙ্গে নন্দরাণীও প্রাণপণ চেষ্টায় গাড়ীর ভিতরে উঠ্‌ল। ভক্তের দল বিস্ময়াবিষ্ট, মেয়ের দল কৌতূহলাক্রান্ত। প্রথমটা মনে হোলো সে বুঝি পায়ের ধূলোই চায় কিন্তু দেখা গেল, পা ধরেই সে বসল, পা আর ছাড়ে না। অভিনব বটে!

তুমি কি চাও মা?

উচ্ছ্বসিত আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে নন্দরাণী বললে, আপনার সঙ্গে—আপনার সঙ্গে আমি যাবো।

বোঝা গেল মেয়েটি তাঁর বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়েচে। হেসে তিনি বললেন, কোথায় যাবে মা?

নন্দরাণী তাকাল তাঁর প্রশান্ত ও প্রসন্ন মুখের দিকে। একান্ত নির্ভরশীল একটি সুন্দরী কুমারীর বড় বড় চোখের কালো কালো তারা। হরিহর নাগ বললেন, বলো মা, কোথা যাবে?

আপনার আশ্রয়ে।—নিবিড় উত্তেজনায় নন্দরাণীর গলার স্বর ভেঙে পড়েছিল।

আমার আশ্রয়ে ?—স্মিতহাস্যে তিনি বললেন, আমার আশ্রয় সে দেশে দেশে মা, কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবো ?

নন্দরাণী বললে, আমি আপনার সেবা করতে চাই। যে পথ আপনি দেখিয়েছেন আমি সেই পথে—

গাড়ী দাঁড়াবার আর উপায় ছিল না। দর্শনার্থী জনতাকে সামলানো কঠিন, এর পরে হয়ত পুলিশের আশ্রয় নিতে হবে। নন্দরাণী কিছুতেই নামতে চাইলে না দেখে হরিহর নাগের সেক্রেটারী মোটর চালাবার ইঙ্গিত করলেন।

গাড়ী চলতে লাগল। হাত ধ'রে নন্দরাণীকে তুলে হরিহর নাগ পাশে বসালেন। সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমার নাম কি মা ?

নন্দরাণী।

এবং তারপর পরিচয় নিয়ে জানা গেল সে এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। বাড়ী এই কাছাকাছি, সংবাদপত্রে নোটিস দেখে এসেছিল আজকের সভায়। এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সে নাকি জীবনে শোনে নি। হরিহর নাগের কথাগুলি তার মনে অগ্নির অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। সে বড় হবে, কাজ করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, অস্বীকার করবে সব। দেশবীর হরিহর নাগের বক্তৃতা তার জীবনে নূতন আদর্শের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছে।

হরিহর বলিলেন, নিজের পথ তুমি নিজে খুঁজে নিতে পারবে ত মা?

নন্দরাণী পুনরায় তাঁহার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন পারি। আমাকে কি করতে হবে ব'লে দিন্।

কি করতে হবে সেই ত তোমার চিন্তা; তোমার ব্যক্তিত্ব আর আত্মশক্তি—এদেরই প্রেরণায় তুমি চলবে ছুটে। যে যুদ্ধে আজ তুমি নামলে, পরিশ্রম আর উৎসাহ, এরাই তোমাকে জয়ের পথে নিয়ে যাবে মা। প্রাণের ঐশ্বর্য্য তুমি ছড়িয়ে দেবে দিকে দিকে। এই তোমার কাজ।—স্মিতহাস্যে হরিহর তার দিকে তাকালেন।

কোন্ পথ কোথায় দিয়ে ঘুরে গাড়ী এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। সবাই নামলেন, নন্দরাণীও নাম্‌ল। সম্ভবত তার বাড়ীর লোকেরা এতক্ষণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তরুণী-সঙ্ঘের আফিসে হয়ত লোক গেছে খুঁজতে। কিন্তু যাক্ সে কথা। আজ তার রক্তের মধ্যে যে প্রবল চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে, আত্মীয় পরিজনের বন্ধন তাকে আর শান্ত রাখতে পারবে না। সে হরিহর নাগের পিছনে পিছনে কটকের ভিতরে প্রবেশ করল। যেন একটা অন্ধ নেশায় সে আত্মহারা।

বাড়ীতেও লোকের ভিড়, স্ত্রী ও পুরুষ জটলা পাকাচ্ছে। নিভৃত জায়গা কোথাও নেই। রাজনীতিক বক্তা, নেতা, স্বেচ্ছা-

সেবক, ভক্ত দর্শনার্থী, সাহায্যকামী, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি, সম্পাদক—চারিদিকে পরিপূর্ণ। হরিহর অন্দর মহলে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ।

অনেকক্ষণ পরে আবার তিনি বেরিয়ে এলেন। দেখলেন নন্দরাণী তখনো একইভাবে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য আর কিছু ছিল না। প্রসন্ন উদাস দৃষ্টিতে তিনি চারিদিকে একবার তাকালেন। অনেকে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে। নন্দরাণীর প্রতি তাঁর কোনো বিশেষ আগ্রহ নেই, আকর্ষণ নেই—তাঁর কাছে যেন সকলেই সমান। তিনি সকলেরই শুভাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ কেউই তাঁর অন্তরঙ্গ আপন নয়।

অত্যন্ত অশোভনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, অত্যন্ত অর্থহীন প্রতীক্ষা। যথেষ্টই সে শুনেছে, আর কিছু জানবার তার নেই। নন্দরাণী এক সময় ধীরে ধীরে পথে নেমে এল। আজকের মতো তাকে ফিরে যেতে হবে। আদর্শটাই পাওয়া গেল, অনুশীলনের পথটা জানা গেল না।

কিন্তু এ কোথায় সে এসেছে? পথের দিকে সে তাকিয়ে দেখলে, এ পথ সে চেনে না। ফুটপাথ ধরে সে মন্থরপদে হাঁটিতে লাগল। হরিহর নাগের কথাগুলো তার মনের তারে তারে এখনো ঝঙ্কৃত হচ্ছে। তার ভিতরে এসেছে ভয়ানক একটা বন্যার বেগ, সব ভাসিয়ে দিতে পারলে তার মন খুসি হয়। জীবনকে সে বড়

ক'রে তুলবে, অস্বীকার করবে সব, প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবে আপন শক্তিতে, মানবে না সে কোনো শাসন ও বন্ধন।

কিছুদূর এসে নন্দরাণী একবার এদিকে ওদিকে তাকাল। ট্রাম চল্‌ছে, মোটর বাস চল্‌ছে কিন্তু সে যাবে কোন্‌দিকে? এ পথটা নতুন। এ পথ তার কলেজেরও নয়, তরুণী-সঙ্ঘেরও নয়। বাস্তবিক, এই উনিশ বছরের জীবনে আজকের মতো সমস্যা তার কোনোদিন দেখা হয় নি। আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা তার কল্পনাতেও ছিল না। বৃহৎ পরিবারের ভিতরে সে মানুষ, বাহিরের জগতের সহিত পরিচয় তার সামান্যই। স্কুলে গেছে, কলেজে পড়েছে, তরুণী-সঙ্ঘের জন্য চাঁদা তুলে বেড়িয়েছে—বিবাহের চেষ্টা চলছে সম্প্রতি। অন্দর মহলের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে নিতান্ত চোখের আড়ালে সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ দেশনেতার কয়েকটা কথার আঘাতে তার সেই বাঁধ গেল ভেঙে—তরুণী-সঙ্ঘের সহস্র বিবাদ-বিতর্কে যা সম্ভব হয় নি। বাইরের বন্যার জল তার প্রশান্ত গৃহাঙ্গনে ঢুকে বাঁধা জলকে আন্‌ল টেনে। এবার তাকে পরিচয় করতে হবে বৃহতের সঙ্গে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আহ্বানে তার প্রাণ উঠেছে জেগে। ঘরে আর তার মন বসবে না।

পথে পথে ইতিমধ্যে কখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে চলতে চলতে সে একবার থমকে দাঁড়াল। না, এ পথ নয়। এদিকে কোনোদিন এসেছে ব'লে মনে হোলো না। তার

কলেজের পথটা পেলেই সে সোজা চলে যেতে পারবে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় প্রত্যেক লোক তার দিকে তাকাচ্ছে, কারো চোখে বিশ্রী কৌতূহল, কারো চোখে কুৎসিত লুব্ধতা নন্দরাণী সঙ্কুচিত হয়ে কুণ্ঠিত হয়ে আবার চলতে লাগল। আপন রূপের খ্যাতি শুনেছে সকলের মুখে, আজ সেই খ্যাতিই যেন তার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হতে লাগল। রূপ না থাকলে আরো দুঃসাহসের সঙ্গে সে এগিয়ে যেতে পারত। আত্ম-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের পথে চেহারাটা যে কিছু সুবিধাও আনতে পারে, কিছু দুঃখও দিতে পারে—এই কথাটাই সে বিশেষ ক'রে ভাবতে লাগল। কিন্তু রূপের সুবিধা নেবার কথাটা তার মনেই এল না। পৃথিবীর সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই তার নেই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিছু রাতে সে বাড়ীতে এসে পৌঁছল। বড় ক্লান্ত, এসব তার অভ্যাস নেই। তাকে যে আবার কোনোদিন পারিবারিক প্রথা ও রীতি অস্বীকার ক'রে ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে এ কোনোদিন তার জানা ছিল না, এ তার নতুন। কিন্তু ভিতরের উদ্দীপনা তার কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। অন্দর মহলে ঢুকতেই সবাই উঠ্‌ল চেঁচিয়ে; উদ্বিগ্ন হয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

বাবা বললেন, তুমি কি আজকের মিটিং শুনতে গিয়েছিলে নন্দরাণী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেমন লাগল?

আমার ত খুব ভালই লেগেছে।

বাবা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। পরে বললেন, না গেলেই ভাল হোতো। অত ভিড়···তুমি একা—কিন্তু ফিরতে এত দেরী হোলো কেন?

নন্দরাণী হকচকিয়ে গেল। মাথা হেঁট করে বললে, একটু বিশেষ কাজে যেতে হয়েছিল।

কাকা বললেন, লোক সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতিস। এত রাত পর্য্যন্ত কাজ?

দাদা বললেন, এঃ, স্বদিশি মিটিং শুনতে যাওয়া! স্বাধীন হচ্ছেন মেয়ে! সেই কখন্ থেকে আমরা খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। গরু হারালেও এতক্ষণে পাওয়া যেত।

নন্দরাণী জলন্ত দৃষ্টিতে একবার দাদার দিকে তাকাল। দাদা পুনরায় বললেন, আঁচলে বেঁধে স্বরাজ আনতে যাওয়া হয়েছিল! বলে, হাতী ঘোড়া গেল তল্, মশা বলে কত জল! গা জ্ব'লে যায়।

নন্দরাণী সোজা গেল নিজের ঘরে। এরা সবাই পুরুষ, এদেরই নিকট নারীর দাসীত্ব, এরাই তাদের বাধা। নারীর স্বাতন্ত্র্য দেখলে পুরুষ মাত্রই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়! নন্দরাণী মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করলে, প্রতিশোধ নিতে হবে। একথা মানুষ হয়ে উঠে জানাতে হবে যে, সে কেবল মাত্র মেয়েমানুষ নয়।

মা এসে বললেন, কোথায় ছিলি মা সারাদিন?

চুলোয়। চুপ ক'রে থাকো, ভালো লাগে না তোমাদের কথা। থাকব না আমি তোমাদের কাছে। এত বিদ্রূপ, এত অপমান?

তার চোখে জল এল।

মা চিন্তিত হলেন। কিন্তু হেসে কাছে এসে নন্দরাণীকে টেনে নিলেন। তার জামার বোতামগুলি খুলে দিতে দিতে বললেন, মুখ যে শুকিয়ে গেছে। কেমন দেখলি রে মিটিং?

আঃ ছাড়ো, আমি খুলছি। জানিনেক' কেমন মিটিং। আমি চাকরি করব মা কাল থেকে।

ও মা, সে কি কথা! চাকরি কেন?

মায়ের গলার ভিতরে মাথাটা ঘষে' নন্দরাণী আদরের সুরে বলতে লাগল, দাঁড়াব নিজের পায়ে।

পিতামাতার একমাত্র মেয়ে সে। চোখ কপালে তুলে মা বললেন, এই জন্যেই তোকে যেতে মানা করেছিলুম। লক্ষ্মীছাড়ার দল, কানে তোর বীজমন্তর দিলে ত? ওরা পাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নেয়। যারা কথা বেশি কয় তাদের ওপর নির্ভর করিস নে। এসো মা, লক্ষ্মীটি, খাবে এসো।

নন্দরাণী স্তম্ভিত হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। চক্ষু বিস্ফারিত

ক'রে বললে, তুমি কিছু জানো না মা, তুমি মোটে চেনো না হরিহর নাগকে। তিনি মানুষ নন্, দেবতা, তাঁর কথা, তাঁর উপদেশ, তাঁর ত্যাগ—

বিহ্বল হয়ে সে জান্লার বাইরে তাকাল। মা তাকে হাত ধ'রে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, দেবতা বলেই ত ভয়। বেশ, চাকরি করবি কাল থেকে; এখন খাবি আয়।

আহারাদির পর নিজের ঘরে এসে নন্দরাণী বসল। আজ তার ঘুম পাবে না। নিত্য পরিচিত জীবন-ধারা থেকে সে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। কাল যা ছিল, আজ তার সঙ্গে অনেক প্রভেদ। তার ঘরে দো'রে, বিছানায়, গৃহ সজ্জায়, তার ভিতরে ও বাইরে যেন একটা ঝড় ঢুকেছে, তাই এমন ওলোটপালট। অনেক কিছু ভাঙল, অনেক কিছু স্থানচ্যুত হোলো। ছবির মতো কখনো তার চোখে ভাসছে সব। বিরাট জনতা, পথের উত্তেজনা, যান বাহনের দ্রুততা, বন্দে মাতরমের চীৎকার—এখনো তার বুকের ভিতরটা আন্দোলিত করছে। তার পর হরিহর নাগের বক্তৃতা, অগ্নিসঞ্চারিণী ভাষা—এখনো তার রক্তের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। এই ঘর, এই পরিবার, এই সমাজ—এ সমস্তই মিথ্যা, এই তার পরাধীনতা, এই তার অভিশাপ।

ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল বটে কিন্তু অন্ধকারে তার বড় বড় চোখের তারা বিনিদ্র হয়ে জেগে রইল।

রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে সকালে নন্দরাণী তরুণী-সঙ্ঘের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ল, সকলের অনুমতি নেবার আর তার অপেক্ষা সইল না। দিনের বেলায় পথের দিকে সে চেয়ে দেখল। কর্ম্মব্যস্ত কলিকাতা শহর। কারো দিকে কারো তাকাবার সময় নেই। এই বিপুল ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে তাকে অবলীলাক্রমে চলে যেতে হবে। পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করবার প্রয়োজন নেই, তাকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যেতে হবে।

কাল রাতে রাস্তাঘাটের অনেক সন্ধান সে এনেছিল। অনেকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে এসে সে হরিহর নাগের ফটকের কাছে পৌছল। ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেল, হরিহর নাগ কন্‌গ্রেসের কাজে বেরিয়ে গেছেন। হাওড়া ময়দানে আজ জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করা হবে। নন্দরাণী ফটকের নিকট থেকে আবার পথে নেমে এল। বোঝা গেল, হরিহর নাগের তরফ থেকে আর কোনো কিছু সুবিধা পাবার আশা কম।

ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে লালিত কিন্তু সেঐশ্বর্য্য পুরুষের হাতে,যেখানে তার অধীনতা। সে দাঁড়াবে নিজের পায়ে, সৃষ্টি করবে সে নতুন জীবন। নন্দরাণী পথের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে চলতে লাগল। প্রথমে সে চাকরি করবে, আর্থিক স্বাধীনতা আনবে সে সর্ব্বপ্রথমে। হরিহর নাগের প্রত্যেকটি কথা তাকে উদবুদ্ধ করেছে,

উজ্জীবিত করেছে। বন্ধন সে মানবে না, ভাঙবে চিরাচরিত রীতি। কিন্তু কোথায় চাকরি? কে দেবে? কেমন ক'রে সে তার আপন দাবি পৃথিবীর কাছে পেশ করবে? সংগ্রাম ক'রে সে দাঁড়িয়ে উঠবে, কিন্তু সুযোগ কই?

পথে একটা প্রকাণ্ড আপিস বাড়ী দেখে সে অতি সঙ্কোচে ভিতরে ঢুকল। চারিদিকে কেরাণি চাপরাশি নানা কাজে ব্যস্ত। একটি তরুণীকে দেখে তারা সবাই চকিত কৌতূহলে কানা-কানি করতে লাগল। সুমুখেই একটা কাউন্টারের কাছে গিয়ে নন্দরাণী পা শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে গলা পরিষ্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে এখানকার কর্ত্তার দেখা পাওয়া যাবে?

কি চাই আপনার?—সবাই খুসি হয়ে সাহায্য করতে ছুটে এল। সে যে স্ত্রীলোক, সুন্দরী! সাহায্য করতে পারলে সবাই খুসি হয়।

নন্দরাণী ঢোক গিলে বললে, তাঁকে বলব। একটা খবর দিন্ না।

খবর দেবো? আচ্ছা, তাঁর নাম কি বলুন ত?

আরে তুই থাম্। আমি জানি কা'কে উনি চান্। শৈলেন-বাবু ত? শৈলেন ঘোষ?

নন্দরাণী বললে, এখানকার বড়বাবুকে।

বড়বাবুকে? ও। রাধানাথবাবুকে। আচ্ছা, আপনি বসুন,

এই যে—এই চেয়ারটায় বসুন, আনছি তাঁকে ডেকে।—এই ব'লে একটা লোক ছুটল।

একটা লোক নেপথ্যে বললে, রাধানাথবাবুর কপাল ভালো।

আপিসের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। নারীর আবেদন সুতরাং একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। নন্দরাণীর মুখ রাঙা হচ্ছে, পা কাঁপছে, কান্না পাচ্ছে। কর্তার সঙ্গে দেখা হ'লে কী যে বলবে কিছুই সে ঠিক করতে পারছে না, সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

খবর পেয়ে বড়বাবু এলেন। প্রবীণ লোক। নন্দরাণী আরো নার্ভাস হয়ে গেল। কিন্তু ভেঙে পড়লে আজকে আর কিছুতেই চলবে না। সবিনয়ে নমস্কার ক'রে সে বললে, আপনার সঙ্গে বিশেষ কারণে দেখা করতে এসেছি।

কাজের সময়, সুতরাং অভ্যর্থনা না করেই বড়বাবু বললেন, কি বলো?

আশে-পাশে সবাই কানাকানি করছে। মুখখানা তার রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। তবু সে স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, যদি আপনার এখানে চাকরি করি তবে কত টাকা মাইনে দেবেন?

ভদ্রলোক আপাদমস্তক তার দিকে তাকালেন, তারপর ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বললেন, তুমি কাদের মেয়ে মা?

গলার আওয়াজ শুনে নন্দরাণী কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ল, লোকটা কী নির্দ্দয়! কিন্তু প্রশ্নটা যে কিছু অপমানজনক তা'তে আর

সন্দেহ নেই। নন্দরাণী আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, চাক্‌রি কি আছে?

ভদ্রলোক বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়?

নন্দরাণী বললে, বিশেষ দুরবস্থায় পড়েছি তাই চাকরির জন্যে আপনার কাছে—

রাধানাথবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, এমন ক'রে বেরিয়ে আসা উচিত হয় নি। লোক দেবো সঙ্গে, বাড়ী যাবে?

সকলের সম্মুখে নন্দরাণীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল, ঠোঁট কেঁপে উঠ্‌ল। কথা বেরুল না।

বিয়ে হয় নি দেখছি। তোমার বাবার নাম কি মা?

কান্না পাচ্ছে, এইবার আত্মগ্লানিতে নন্দরাণীর চোখে জল এসে পড়্‌বে। ঢোক গিলে মাথা হেঁট ক'রে সে বললে, আমি চাকরি করতে এসেছি, একটা চাকরি দিন্।

রাধানাথ বললেন, কা'র সঙ্গে তুমি এসেছ শুনি? একলা আস নি মনে হচ্ছে।

ইঙ্গিতটা খুব আপত্তিকর, অপমানে নন্দরাণীর মাথা আরো হেঁট হয়ে এল। ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, ভদ্রঘরের মেয়ে তুমি, লোকে যে তোমার নিন্দে করবে! তুমি বাড়ী ফিরে যাও মা! কলকাতা শহর ভালো জায়গা নয়—

চারিদিকে লোক জমে গেছে। বিশ্রী একটা আন্দোলন চলছে, অবশ্য একটা জটলা। চাকরি খুঁজতে আসা যেন একটা ভয়ানক অপরাধ। কেউ দেবে না তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে, সবাই তার শত্রু। এরা সবাই পুরুষ, এরাই আপন শক্তিতে নারীকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, এদের হাতেই আইন, পৃথিবী এদেরই করতলগত।

নন্দরাণী মুখ তুলে বললে, দেবেন না চাকরি?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, কা'র জন্যে তুমি চাকরি করবে মা?

নিজের জন্যে করব।

নিজের জন্যে?—হো হো ক'রে হেসে উঠে ভদ্রলোক যেন তার সমস্ত উচ্চাভিলাষ চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিলেন।

কি অপমান, কি লাঞ্ছনা! এই কি তার কপালে ছিল? এই আত্মঘাতের নাম কি জীবন সংগ্রাম? আহত এবং অসম্মানিত হয়ে নন্দরাণী যাবার উদ্যোগ করতেই বড়বাবু পুনরায় বললেন, আচ্ছা আচ্ছা হবে, তুমি এখন বাড়ী যাও মা। ছি, ঝগড়া করে কি পথে বেরিয়ে আসতে হয়? এমন কাজ ভালো নয়। কত কষ্টে মা বাবা তোমাকে মানুষ করেছেন বলো ত?

নন্দরাণী আর দাঁড়াল না, কোনোক্রমে একটা নমস্কার জানিয়ে সে পথে বেরিয়ে এল। কলিকাতা শহর কি ভয়ঙ্কর! আত্মপ্রত্যয়ের কোনো মূল্য নেই, পরিশ্রমের কোনো প্রতিদান নেই। কোনো উপায়ই যদি তার চোখে না পড়ে, কোনো সুযোগই

যদি সে না পায় তবে সে দাঁড়াবে কি নিয়ে? এমনি করেই কি তাকে মিথ্যার পিছনে ছুটোছুটি করতে হবে? তবে কি হরিহর নাগের বক্তৃতা কেবলমাত্র কথার স্তূপ, কেবলমাত্র প্রেরণা? ওই দেশনায়কের কথার আঘাতে আরো কি কোনো মেয়ের ঘরের আগল ভেঙে গেছে?

সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে নন্দরাণী বাড়ীর দিকে চলতে লাগল। এ তার জীবনে ভয়ানক একটা অভিজ্ঞতা! বাড়ী থেকে সে যে পালিয়েছে, এখন কী ব'লে কৈফিয়ৎ দেবে? বিদ্রূপ কি সেখানেও নেই? কিন্তু এখন থেকে ঘরের ভিতরে অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকতে তার আর ভালো লাগবে না; তার সমস্ত স্বপ্ন যে দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হবে, চুরমার হতে থাকবে যে তার সকল সম্ভাবনা—এ তার পক্ষে অসহনীয় বেদনা! কিন্তু পথেই বা তার কী মিলবে? কোন্ আদর্শের পিছনে ছুটবে? পথে নেমে সে পথ খুঁজবে কোন্ দিকে?

অনেকক্ষণ থেকে একটা লোক তার পিছু নিয়েছে। সে যেন খাদ্য, সে যেন ভোগ্যবস্তু। এ সংসারে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করাই যেন একটা পাপ। তাদের সমস্ত যোগ্যতা যেন পুরুষের যোগ্য হয়ে ওঠার একটা সাধনা। অপমানে নন্দরাণীর দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে এল। পা চালিয়ে সে চলতে লাগল। তার চেয়ে সর্ব্বস্বান্ত যেন আর কেউ নয়!

গত দুই দিন আগে তার এই চাঞ্চল্য ছিল না। কল্পনাও করে নি এমন একটা বিপ্লব অবিলম্বে ঘটবে তার মনে। এখন থেকে ভয়ানক একটা অতৃপ্তি আর অস্থিরতায় তার ঘর ও বাইরের জীবন তুঁষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকবে। সমস্যার দোলায় সে দুলতে লাগল। একদিকে বন্দিনীর জীবন যাপন, অন্যদিকে মরুভূমির মধ্যে বিচরণ—কোন্‌টা তার বরণীয় ?

পথ ঘুরে সে এসে পৌঁছল তরুণী-সঙ্ঘে। তার যেন আর মন নেই। সবাই অনেক প্রশ্ন করলে, অনেক কথা জানালে, নানা আলোচনার ঢেউ তুললে। কিন্তু এসব যেন ছায়া, এবং যেন প্রাণহীন। মেয়েদের এড়িয়ে নন্দরাণী আবার বেরিয়ে পড়ল।

সকল পথই যেন তার জটিল হয়ে উঠেছে। তবু বাড়ীর দিকে না গিয়ে আর উপায় নেই। অশান্ত মন, সমস্ত শরীর ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন, পা দুখানা কাঁপছে, মুখে একটি গভীর ব্যর্থতার ছায়া—এমন অবস্থায় নন্দরাণী সেদিন অপরাহ্ণে চিন্তাক্লিষ্ট করুণ দৃষ্টি নিয়ে ধীরে ধীরে তার বাড়ীর দরজায় এসে উঠল। তার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই !

*

* *

মেয়েদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাঁদা দিয়েছেন, মৈত্রেয়ী ও অণিমার বিশেষ বন্ধু—ছোড়দি তাঁদের মধ্যে একজন। ছোড়দি নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত। বাড়ী তার এই কাছাকাছি।

বাড়ীর ছেলেমেয়ে ও পাড়ার মেয়ে পুরুষের কাছেও তিনি ছোড়দি নামে পরিচিত। বয়সের পার্থক্যটায় কিছু আসে যায় না। তিনি স্বপদবীধন্যা। বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন মেসিন্ ঘরের সকল যন্ত্রগুলিকে নিরন্তর সচল ক'রে রাখে তেমনি ছোড়দির গোপনসঞ্চারিণী প্রেরণায় পরিবারের সকল খুঁটিনাটিগুলি অবিশ্রাম সক্রিয়। তাঁর শাসন ও বিলিব্যবস্থায় সবাই খুসি।

অণিমা বলে, ছোড়দি একজন বিশিষ্ট ছন্দ-শিল্পি, ওই অত বড় পরিবার একটি ছন্দে বাঁধা। ছোড়দির সংসারটা তাঁর একটি কবিতা।

মণিকা বলে, ছেলেমেয়েকে সুশিক্ষিত ও ভদ্র ক'রে মানুষ করতে ছোড়দি অদ্বিতীয়। যাই বলো 'তরুণী-সঙ্ঘে'র কপাল ভালো, অমন একজন মেম্বার পাওয়া গেছে।

অণিমা বললে, আহা, ছোড়দিকে সেদিন কী ভালোই

জেগেছিল। সকাল বেলা গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ছোড়দি পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পরণে তসরের ধুতি, গলায় সোনার চেন-এ বাঁধা রুদ্রাক্ষের মালা, প্রসন্ন উদাস দুটো চোখ—

মণিকা মৈত্রেয়ীর গা টিপলে। অর্থাৎ ছোড়দির কথা উঠলেই অণিমার কবিত্ব জেগে ওঠে।

রূপ বটে!—অণিমা বললে, পাকা সোনা, খাদও নেই, পালিশও নেই। সত্যি ভাই, আমি পুরুষ হ'লে ছোড়দিকে নিয়ে কী যে করতুম বলা যায় না।

মণিকা বললে, ওমা, ছোড়দি যে বিধবা রে।

হোক না, ইলোপ্ ক'রে নিয়ে যেতুম। জেলে যেতে ভয় পেতুম না।

মৈত্রেয়ী মুখ টিপে হেসে বললে, ওকে সঙ্গে নিয়ে ত আর জেলে যাওয়া যেত না!

সবাই হাসতে লাগল। সেদিন কথায় কথায় স্থির হোলো, আজ ছোড়দির বাড়ী একবার বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না। সোসাল্ ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে ছোড়দির পরামর্শটা অমনি নিয়ে আসা যাবে। সবাই রাজি হোলো। স্ত্রীলোকের দলের ভিতর কোনো বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রিয় হয়ে ওঠা বড়ই কঠিন। ছোড়দি সেই কঠিন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ।

চার পাঁচ জন মিলে সেদিন ছোড়দির কাছে এসে যখন

উপস্থিত হোলো তখন অপরাহ্ণ। তারা একেবারে অন্দর মহাল গিয়ে হাজির। ছোড়দি কলঘরে গেছেন, তারা বসে রইল প্রতীক্ষায়। চারিদিকে চকচকে আসবাবপত্র, রংচঙে ঘর দালান, পরিচ্ছন্ন বেল ও তুলসীতলা, ঠাকুর ঘর, সুসজ্জিত বাথরুম্—ওদের দিকে চাইলেই ছোড়দি সকলের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেন। এরাও যেন নীরবে তাঁর প্রশংসা করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে ছোড়দি এলেন বেরিয়ে। তাঁর মাথার চুলে লাগল অপরাহ্ণের লাল আলো, তা'তে দেখা গেল চুলের ভিতরে বিচিত্র রামধনুর খেলা। বললেন, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম, কেমন?

অণিমা বললে, তোমার কথা উঠলে তোমাকে না দেখে আর আমরা থাকতে পারি নে।

ছোড়দির সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ, কিন্তু আপন গাম্ভীর্য্যে কেমন একরকম নির্লিপ্ত। হেসে বান্ধবীদের হাত ধ'রে উপরে নিয়ে গেলেন।

আসবাবপত্রের সজ্জা ঘরের মধ্যে প্রচুর; সেগুলি সৌখীন এবং আধুনিক। পাশেই বড় একটা কাঁচের পাত্রে জলের মধ্যে কতকগুলি নানা রঙের মাছ খেলা করছে। ছোড়দি প্রথমেই সুইচ্ বোর্ডে রেগুলেটর ঘুরিয়ে মন্দগতি পাখা দিলেন খুলে, তারপর একটি সাদা ব্লাউস ও ধবধবে সাদা ধুতি নিয়ে পাশের ঘরে কাপড় ছাড়তে গেলেন।

যখন পুনরায় এলেন তখন কিছু পরিবর্তন। তাঁর রূপের বর্ণনা করতে সঙ্কোচ হয়। প্রথমেই নজরটা গিয়ে পড়ে তাঁর দেহের বয়সটার দিকে। কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে কোন একটা অঙ্কে গিয়ে হঠাৎ যেন তাঁর কোমল ও দীঘল দেহখানি থমকে দাঁড়িয়েছে। রূপ দেখলে ওদের মুখে আর কথা ফোটে না, ওরা যেন সবাই ম্লান হয়ে যায়। কখনো দেখা যায় তপস্বিনী অপর্ণার মতো তাঁর দীর্ঘায়ত চোখে সন্ধ্যাতারার গভীরতা, কখনো আবার সে চোখে নামে বুদ্ধি এবং জীবনচেতনার দীপ্তশ্রী—তখন সে দৃষ্টি উজ্জ্বল, অন্তর্ভেদী।

বছর দশেকের একটি মেয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। ছোড়দি বললেন, খুকি, তোমার গানের সুর মুখস্থ হয়েছে?

খুকি বললে, হয়েছে ছোড়দি, শুনবেন?

মৈত্রেয়ী বললে, এখানেই গাও, আমরা শুনি।

ছোড়দির ঘরের টেব্‌ল্ হারমোনিয়ম্ খুলে খুকি গান গাইলে। তারপর যথারীতি বান্ধবীদের জলযোগের আয়োজন।

মৈত্রেয়ী বললে, ছোড়দি, তুমি যে পাকা অভিজাত তা'তে আর সন্দেহ নেই।

ছোড়দি ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, এই কথাটা বাড়ী বয়ে এসে না বললে মৈত্রেয়ীর আর ঘুম হয় না। পাকা অভিজাতের মানে?

তোমার কাছে এলে সবাই আড়ষ্ট হয়ে উঠি।

সেটা ত আমার সুনাম নয়।

তোমার দোষ এমন বলব না। তোমার চারদিকের 'এয়ারটাই' এমনি। বেশি বললে অণিমার গায়ে লাগবে ভাই, ও তোমার অন্ধ ভক্ত। ভক্ত হনুমান।

অণিমা হেসে বললে, পুরুষ হলে আরো বেশি ক'রে ভক্ত হতুম, তা'তে ছোড়দির জন্যে যদি মুখের চেহারাটা হনুমানের মতন হোতো লজ্জা পেতুম না, সয়ে যেত।

কথায় কথায় আবার হাসির পালা।

মৈত্রেয়ী বললে, তোমার হোমিওপ্যাথী কেমন চলছে?

মণিকা বললে, সে আবার কি রকম?

ছোড়দির দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা থাকে দুপুরবেলায় একঘণ্টার জন্যে। পাড়ার লোকেরা ওষুধ নিয়ে যায়।

ছোড়দি মধুর হেসে বললেন, প্রশংসায় লজ্জা পাবার বয়সটা এখনো আছে মৈত্রেয়ী।

আচ্ছা, এই চুপ করলুম। কিন্তু এবার যদি তোমাকে নিয়ে হাসি, তবে কিছু মনে করবে না ত?

না। ছোড়দি বললেন।

মৈত্রেয়ী বললে, শোন্ ভাই অণিমা, বাড়ী মধ্যে কোথাও হাসিতামাসা হ'লে ছোড়দি উঠে চ'লে যায় সেখান থেকে। সামান্য মিথ্যেকথা কেউ বললে রাতে ওর ঘুম হয় না।

তারপর ?—ছোড়দি বললেন।

মৈত্রেয়ী বলতে লাগল, আরো আছে। খবরের কাগজের মারফৎ যদি নারীহরণের খবর কানে আসে এই ভয়ে ও খবরের কাগজ আনা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। কি অণিমা, তুই না ওর ভক্ত ? আরো শোন্, বাড়ীতে তরুণ লেখকদের বই ঢোকবার হুকুম নেই, হুকুমটা ছোড়দির। চরিত্র খারাপ হবার ভয়। মণ্টু কোথা থেকে একদিন একটা অশ্লীল কথা কুড়িয়ে বাড়ীতে এনে ছেড়ে দিয়েছিল ব'লে ছোড়দি তিনদিন কেঁদেই খুন। কেউ কোথাও অন্যায় করেছে শুনলে ছোড়দি ঠক ঠক ক'রে কাঁপে !

মণিকা বললে, কাঁপে কেন ?

মৈত্রেয়ী বললে, ভয়ে। পৃথিবী বুঝি রসাতলে গেল।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক পড়ল, ছোড়দি ?

ছোড়দি বেরিয়ে আসতেই ছোটভাই বিজু এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। বললে, কাল আমাদের ম্যাচ্ খেলা হয় নি, জানো ত ছোড়দি ?

ছোড়দি বললেন, হয় নি ? কেন রে ?

আমাদের বন্ধু শ্রীমান্ বাদলবাবু এসে জুটতে পারলেন না।

তার বলবার ভঙ্গি দেখে ছোড়দি হেসে উঠলেন। বললেন, বর্দ্ধমান থেকে না তার আসবার কথা ? বোধ হয় সময় মতো ট্রেণ ধরতে পারে নি।

ঠিক তাই। অতএব খেলা বন্ধ রাখতে হোলো। ও খুব ভালো খেলে, না ছোড়দি? শট্‌গুলো ভারি য়্যাকুরেট্, স্মার্ট। পড়া-শুনোতেও ভালো, এবার বি-এতে স্কলারশিপ পাবে। একটা চিঠি দিয়েছে, এইমাত্র পেলুম।

ভালো আছে ত? কি লিখেছে?

কাল এসে বেলা তিনটেয় পৌছবে। আমাদের এখানেই থাকবে, কেমন ছোড়দি?

বেশ ত, ওদিকের বারেন্দার ঘরটা তাকে দিয়ো। ঘরটা ভালো। বাদল বুঝি তোদের হাফ ব্যাকে খেলবে?

হ্যাঁ ছোড়দি, সেন্‌টার হাফ। ও শিগ্‌গিরই মোহনবাগানে ভর্ত্তি হবে।—বলতে বলতে বন্ধুর গৌরবে গর্ব্বিত মুখখানা নিয়ে বিজু বেরিয়ে চ'লে গেল।

ছোড়দি একবারটি রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে রান্নার উপদেশ দিয়ে আবার উপরে উঠে এলেন। তারপর ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে বললেন, যেয়ো না ভাই, একটু বসো তোমরা, সন্ধ্যে আহ্নিকটা সেরে আসি; অনেকক্ষণ গল্প করব।

পরদিন বেলা সাড়ে তিনটে বাজে। ছোড়দি বারান্দা থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলেন, একটি বলিষ্ঠ সুশ্রী তরুণ যুবক বিজুর গলা

ধরাধরি ক'রে হাসতে হাসতে উপরে উঠে আসছে। তিনি সিঁড়ির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। দুই বন্ধুর পায়ের শব্দ উপরে উঠে এলো। পরিচয় আগেই ছিল সুতরাং তার প্রয়োজন হোলো না। বাদল হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, চিনতে পারেন ছোড়দি?

ছোড়দি হেসে বললেন, না। অনেক বড় হয়ে গেছ।

বেশ লোক ত আপনি? দু বছরে আমি এত বদলেছি?

জোয়ার আসে এক মুহূর্তে, নদীকে আর চেনা যায় না। আগে একটু রোগা ছিলে, রোগা আর দুরন্ত।

এখনই বুঝি খুব শান্ত হয়েছি?—বাদল হা হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, তা হলেই খুব আমাকে চিনেছেন দেখছি। আগে ইস্কুল পালাতুম, আজকাল কলেজ পালাই।

উত্তরে ছোড়দি বললেন, কলেজ পালিয়েও স্কলারশিপ?

বাদল বললে, এই ষ্টুপিড্ বুঝি আপনাকে খবরটা দিয়েছে ছোড়দি?

বিজু বললে, তুই পেতে পারিস আর আমি বলতে পারিনে?

বাদল বললে, বাঁধাবাঁধি আমার ভালো লাগে না ছোড়দি। যাক্ সে কথা, আপনি কেমন আছেন বলুন।

বলো ত কেমন আছি?

ছোড়দির জীবনে যে সাধ আহ্লাদ নেই, একথা সবাই জানে। বাদল মাথা হেঁট ক'রে বললে, আমি কি ক'রে বল্‌ব?

তার অপ্রতিভ অবস্থাটা উপভোগ্য। ছোড়দি বললেন, মানুষ কেমন থাকে তার মুখ দেখলে বোঝা যায় না ?

বাদল হেসে বললে, খানিকটা বোঝা যায়, বাকিটা বুদ্ধির বাইরে।

সেই জন্যেই ত এত অশান্তি। এস ভাই, এই তোমার ঘর। বিজু, বাদলের স্যুটকেসটা রেখে এস ওঘরে। ব'লে ছোড়দি আগে আগে গিয়ে ছোট ঘরটিতে ঢুকলেন।

বাদল বললে, আমি কিন্তু নিতান্ত অস্থায়ী লোক ছোড়দি। কাল সকালে গিয়ে আমাকে বর্দ্ধমানে পৌছতেই হবে।

সে কি কথা ? হাওয়ার মতন এলে, ঝড়ের মতন যাবে ?

সে জন্যে নয়, কাল আমাদের কলেজে টাকা জমা দেবার তারিখ, তাই যেতেই হবে। আজ রাতে একবার যাব বৌবাজারে মেজদির কাছে। আমার বড়দা গিছলেন হিমালয় ভ্রমণে, সেখান থেকে এনেছেন শিলাজিৎ, এক শিশি মেজদিকে দিয়ে আসতে হবে।

একটা চেয়ারে গিয়ে বাদল বসল, ছোড়দি সুইচ্ টিপে তার মাথার উপরে পাখা খুলে দিলেন। তার কপালের পাশ দিয়ে যে দুটি ঘামের ধারা গালে নেমে এসেছিল ছোড়দি সেদিকে চেয়ে বললেন, বেশ ত, যাবার ব্যবস্থা আমার হাতে, তুমি এখন মুখখানা মুছে ফেল দেখি। পাঞ্জাবীটা খোলো। চান্ করবে ?

আগে চা খাবো।

আগে না, আগে চান্ করো। তোমাদের খেলা ক'টার সময়? সাড়ে পাঁচটা ত? অনেক সময় আছে। খোলো, পাজামাটা আগে খুলে ফেলো।

হ্যাঁ, এইবার খুলব।

এখনি খোলো, লজ্জা করবার মতন দেহ তোমার নয়। খুলে চান্ ক'রে এসো। এই কাপড় রয়েছে টাঙানো।

গায়ের জামা খুলতেই ছোড়দি সেটা ওর হাত থেকে নিয়ে আল্‌নায় তুলে রাখলেন। বললেন, শরীরটাকে এমন মজবুত ক'রে গড়েছ, পুলিশে না বিপ্লবী সন্দেহ ক'রে ধরে নিয়ে যায়!

বিজু নিচে থেকে বললে, ছোড়দি, খাবার তৈরি হয়ে গেছে।

ছোড়দি গলা বাড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, এসো ভাই, তোমায় বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। বলে বাদলের হাত ধরে তিনি বেরিয়ে এলেন।

ছোড়দির এই সহৃদয় ও ঐকান্তিক আতিথ্যে বাদল একটু বিপর্য্যস্ত। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে সাবান, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে এলেন। বললেন, সব রইল ভাই এখানে। তোমার জন্যে চা করতে চললুম।

স্নানের পর বাদল বেরিয়ে এলো, ছোড়দি চিরুণি ও বুরুশ দিয়ে তার মাথা আঁচড়ে দিলেন। নিজের হাতে নিয়ে এলেন

চা আর খাবার। বিন্দু এসে একবার তাড়া দিয়ে গেল। ছোড়দি তাকে খাওয়াতে বসে বললেন, আমার দুঃখ এই যে, তুমি পর।

বাদল হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। বললে, আমি পর, সে ত আপনার চোখের দোষ ছোড়দি।

চোখের দোষ হতে পারে, তবুও তুমি আপন নও। দাঁড়াও ভাই, ছেলেদের খাওয়াটা একবার দেখে আসি।—বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে যখন এলেন, বাদল তখন হাফপ্যাণ্টে দড়ি লাগিয়ে কোমরে বাঁধছে। ছোড়দি হেসে বললেন, ও কি হচ্ছে, চোরের মতন? দাঁড়াও, আমি বেল্‌ট এনে দিচ্ছি। আমার কাছে যা নেই তা বাজারেও নেই।

কিন্তু যা আছে তা যে কোথাও নেই ছোড়দি?

কী সে?—বলে তিনি উত্তর না শুনেই আবার বেরিয়ে চলে গেলেন।

কোমরে বেল্ট্‌ বেঁধে ছোড়দির কাছ থেকে দইয়ের টিপ নিয়ে দুই বন্ধু ম্যাচ্‌ খেলতে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোড়দি তাদের পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাদল যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আহারাদি সেরে রাত্রেই তার চ'লে যাবার কথা। বৌবাজারে রাতটা কাটিয়ে সকালের গাড়ীতে সে বর্দ্ধমান ফিরে যাবে।

বাড়ী ফিরতেই পরম্পরায় জানা গেল, খেলায় আজ তাদের হার হয়েছে। সংবাদ শুনে ছোড়দি বেরিয়ে এলেন। বাদল বললে, কি করব বলুন ছোড়দি, দশচক্রে ভগবান আজ ভূত হোলো। একা কি করতে পারি বলুন ত?

ছোড়দি হেসে বললেন, আমার তিলক নিয়ে যারা যায় তারা কোথাও জয়ী হয় না। তারা ফেরে লজ্জা নিয়ে, তাতেই আমার আনন্দ।

কি বলছেন ছোড়দি?

ছোড়দি বললেন, এমন নয় যে মানুষের অপমান দেখে আমার আনন্দ। আমার আনন্দ ভাই তাকে দেখে যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়, যে দুঃখ পেয়েছে, যে হেরেই এসেছে বার বার।—তার চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠল।

বাদল একটু অধীর হয়ে বললে, আপনার চরিত্র অত্যন্ত য়্যাব্‌সার্ড।

তা হবে। তাই ত বলচি ম্যাচে যে জেতে তার সঙ্গে আমার ম্যাচ করে না।—মৃদু মৃদু হেসে ছোড়দি বেরিয়ে গেলেন।

যাবার একটা তাড়া ছিল। ছোড়দি আর অনুরোধ করলেন

না, কিন্তু বাদলকে খাওয়াতে বসলেন। বিজু বসল পাশে। সে আজ তার ছোড়দিকে দেখে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় বোধ করছে। ছোড়দির গাম্ভীর্য্য যেন আজ কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্ত্তে খসে গেছে। সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়ে আজ যেন তাঁর বিপুল উৎসাহের জোয়ার।

আহারাদির পর তিনি ভিতর বাড়ীতে অন্যান্য বালক বালিকার আহারের তদ্বির করতে গেলেন। বাদল জামা-কাপড় প'রে নিলে। তাকে বাস-এ তুলে দেবার জন্যে বিজু প্রস্তুত হোলো। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা অপ্রীতিকর ঘটনায় সে একটু চঞ্চল হয়ে বাদলের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। বাদলের স্যুটকেসটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই ত টিপাইয়ের ওপর রেখেছিলুম, তুই বুঝি কোথাও সরিয়ে রেখেছিস?—বিজু বললে।

না রে, আমি আর হাত দিইনি।—বাদল বললে।

তবে গেল কোথা?—ব'লে বিজু ছোড়দির ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল।

এঘরে আঁতিপাঁতি খুঁজে সে গেল পাশের ঘরে। সে ঘরে সমস্ত ওলটপালোট ক'রে খুঁজলে। ছেলেমেয়েদের ঘরে গিয়ে খুঁজে বেড়াল, নিজের ঘরে গিয়ে চারিদিক দেখ্‌ল। শেষকালে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ছোড়দিকে সংবাদ দিতে বিজু বাধ্য হোলো।

ছোড়দি, আপনি এখানে?

পিছন ফিরে তিনি তাকালেন। বললেন, কে, বাদল? চলো ঘরে যাই, তোমার যাওয়া ত তাহলে হোলো না দেখছি।

ছাদের কোলেই তাঁর ঘর। ভিতরে ঢুকে বললেন, তোমার জিনিসটার কথাই ভাবছি। এ রকম কখনো হয় না। ভোজবাজীর মতন কোথায় যে···আশ্চর্য্য!

বাদল বললে, স্যুটকেশটার জন্যে নয়, আমি ভাবছি মেজদির ওষুধটার কথা। শিলাজিৎ হিমালয় ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। ওটা যদি ফিরে পেতুম।

তাই ত, তোমাকে তাহলে থেকেই যেতে হোলো!

না ছোড়দি, এ রাতে যাওয়া হোলো না, ভোর রাতে আমাকে চ'লে যেতেই হবে। মেজদির ওখানে না গিয়েই চলে যাবো, কাল আমাদের টাকা জমা দেবার দিন। যেতেই হবে।

তুমি ত ভারি একগুঁয়ে বাদল। যদি ঘুমিয়ে পড়ো তা হলে কেমন ক'রে প্রতিজ্ঞা থাকবে?

প্রতিজ্ঞা নয় ছোড়দি, প্রয়োজন।

প্রয়োজন? আশ্চর্য্য তোমাদের শিক্ষা! এ ছাড়া আর কোনো দাবি নেই? কেন থাকতে চাও না তুমি এখানে?—ছোড়দি অধীর হয়ে প্রশ্ন করলেন।

বাদল দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরজায়, মুখের ওপর তার বিদ্যুতের

আলো খেলছে। ছোড়দি ছিলেন খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়িয়ে। বাদল হঠাৎ হেসে বললে, ওরে বাবা, শ্বেত পাথরের মতন আপনার মুখ ছোড়দি, কথা কইতে ভয় হয়। আমার কিন্তু সত্যিই যাওয়া দরকার, আপনি একটু বিবেচনা করুন।

কি বলো?

বাদল একটু থাম্‌ল, তারপর ঢোক গিলে হেসে বললে, বলছি ওই স্যুটকেশটারই কথা, ওটা পেলেই আমি চ'লে যেতে পারি।

ছোড়দি তার মুখের দিকে তাকালেন। বাদল হেসে উঠে বললে, আমি দেখতে পেয়েছিলুম ছোড়দি, আপনি যখন ওটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ছোড়দি কেঁপে উঠে বললেন, কখন্?

যখন আমি খেলার পর ফিরে ঘরে ঢুক্‌ছিলুম।

তার মানে বাদল? আমি চোর?—তিনি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন।

কিন্তু দাঁড়ালেন না আর, ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গেলেন বটে, আবার ঝড়ের মতো ফিরে এলেন তৎক্ষণাৎ। গায়ের রক্তে তাঁর ধরেছে জ্বালা। খানিকক্ষণ ভিতরে ঘুরে বেড়ালেন, এটা ওটা নাড়লেন, তারপর চাবি খুলে আলমারির ভিতর থেকে বাদলের স্যুটকেশ বা'র করলেন। বললেন, এই নাও, আমিই চোর। আর তোমার চ'লে যাবার বাধা নেই, কেমন?

স্যুটকেস হাতে নিয়ে বাদল বেরিয়ে যাচ্ছিল, ছোড়দি পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, চুপ ক'রে চলে যাচ্ছ যে? চোর ব'লে নিন্দে ক'রে গেলে না? আচ্ছা যাও, এক মুহূর্তও আর দাঁড়িয়ো না। তুমি গেলে দরজা বন্ধ ক'রে দেবো।

বাড়ীতে তখন সবাই নিদ্রিত।

বাদল নিচে নেমে এলো। পিছনে পিছনে নেমে ছোড়দি বললেন, আমাকে যেন আজ ভূতে পেয়েছে! কী হয়ে বেঁচে আছি বলো ত? সৎ, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক! এর কি দরকার, এসব কি হবে আমার, বলতে পারো বাদল?

বাদল সদর দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে গেল। একটি কথাও সে বললে না। ছোড়দি গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন, তারপর অস্ফুট আর্ত্তকণ্ঠে বললেন, তুমি রইলে না, কিছুতেই থাকলে না একটা দিন, যাবার সময় চোর ব'লে আমাকে জেনে গেলে।

থেকে কি হোতো ছোড়দি?

থাকলে তোমাকে বোঝাতুম, উঁচু আসন আর আদর ভালো লাগে না। শ্রদ্ধা আর সম্মানের ভার মাথায় নিয়ে নিরর্থক বাঁচা ···ক্লান্ত, আমি বড় ক্লান্ত বাদল।

দরজার চৌকাঠে পা দিয়ে বাদল হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেল, তিনি স'রে দাঁড়ালেন। বললেন, না না না, ছুঁয়ো না,

শুধু ছুঁয়ে চ'লে যেয়ো না বাদল। তখন আমার পা ছুঁয়েছিলে তুমি—জানো না, তুমি ছুঁলে আমার কী হয়, কী যন্ত্রণায় আমার চোখ বুজে আসে। তুমি যাও বাদল, যাও সুমুখ থেকে।

বাদলকে একরূপ বা'র ক'রে দিয়ে ছোড়দি সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলেন।

*

* *

অনেকদিন ধরেই 'তরুণী-সঙ্ঘে'র চাকাটা ঠিক মতো ঘুরছে। কাজ এগিয়েছে অনেকখানি। বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। অনেকের অনেক স্বার্থত্যাগ সার্থকতা পেলে। মেয়েদের পরিচর্য্যায় কোনো প্রতিষ্ঠান টি'কে যাওয়া—এটা নতুন। এটা কম বাহাদুরি নয়।

সেদিন ঘটনার মোড় একটু ঘুরে গেল। মৈত্রেয়ী একটু দেরিতে এসে হাজিরা দিলে, অণিমা জিজ্ঞাসা করলে, বসেই আছি তোমার জন্যে, মনে আছে ত আজ রূপেনবাবুর ওখানে যাবার কথা?

মৈত্রেয়ী কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করলে। বললে, আরে, তাইত দেরি হয়ে গেল ভাই, রূপেনবাবুর ওখান থেকেই ত আমি এখন এলুম।

আহত বিস্ময়ে অণিমা বললে, তাঁর ওখান থেকে? আমাদের একসঙ্গে যে যাবার কথা ছিল?

আসছিলুম ওই পথ দিয়ে। ডাক্‌লে প্রভা।

ওপথ দিয়ে না এলেই ত পারতে? রূপেনবাবুর রাস্তা দিয়ে যাতায়াতটা তোমার আজকাল বেড়ে গেছে মৈত্রেয়ী।

খোঁচা খেয়েও মৈত্রেয়ী উত্তর দিলে না, তার মনটা যেন কোথায় অপরাধ করেছে। বললে, প্রভার ডাকে ভেতরে যেতে হোলো।

তার সঙ্গে রূপেনবাবুর ঘরে ঢুকে দেখি, ভদ্রলোক কাজে ব্যস্ত। নতুন আই-সি-এস্ কিনা, কাজে এখন অখণ্ড মনোযোগ। ছুটি ফুরোলেই চাকরি স্থানে যাবেন।

অণিমা চেয়েছিল সোজা তার মুখের দিকে, মৈত্রেয়ীর মুখের রাঙা আভা তার দৃষ্টি এড়াল না। কোথায় সে যেন একটা গভীর বিরক্তি বোধ করছে। কিন্তু উষ্মা প্রকাশ করা তার শিক্ষাবিরুদ্ধ। নীরস কণ্ঠে একবার বললে, আমাদের চাঁদাটা পেলেই হোলো মৈত্রেয়ী। অন্তত আমার স্বার্থ ওইখানেই।

মৈত্রেয়ী বললে, আমারো ত তাই ভাই।

তোমার তাই কিনা জানিনে, কিন্তু আমি এটা বুঝতে পেরেছি, কোনো প্রতিষ্ঠানকে নির্দ্দোষ ক'রে দাঁড় করাতে গেলে জীবনের অনেক দিকের অনেক আশাকে নির্ম্মূল করতে হয়।—বলেই অণিমা মুখ ফিরিয়ে লাইব্রেরীর দিকে চ'লে গেল।

মৈত্রেয়ী রইল তার দিকে চেয়ে। আবাল্য তাদের বন্ধুত্বের ভিতরে ভুল ত্রুটি, সন্দেহ সংশয় কোথাও নেই। একজন আর একজনের জন্য অনেক কিছু জলাঞ্জলী দিতে পারে এই ছিল তাদের ছেলে বয়সের প্রতিজ্ঞা। দিয়েছেও কম নয়। কিন্তু নতুন বটে তাদের ভিতরে এই বিসদৃশ ব্যবহার। হঠাৎ মনে হোলো কোথায় যেন একটা ফাটল ধরেছে। সম্ভবত সে ফাটল মনে, যেন শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতরে এই চিড় খাওয়ার টনটনানি; পরস্পর

পরস্পরকে যেন আহত করেছে। হয়ত সে অন্যায় করেছে একা সেই আই-সি-এস রূপেনের কাছে গিয়ে। কিন্তু প্রভা ত ছিল সঙ্গে তার! মনস্তত্ত্বের শাস্ত্রটা তার কিছু আলোচনা করা আছে। রূপেনের কাছে একা যাবার প্রলোভন কি সে মনের গোপনে লালন করেছিল কিছুকাল থেকে? কিন্তু তার জন্য রাগ কেন অণিমার? নীতির দিক থেকে সন্দেহ, না স্বার্থের দিক থেকে ঈর্ষা?

মৈত্রেয়ী বাড়ী ফিরে গেল তখনকার মতো।

অপরাহ্ণের দিকে এসে হাজির হোলো রূপেন আর প্রভা। প্রভা এলো তার এক বছরের শিশুকে নিয়ে। বললে, মৈত্রেয়ী কোথায় রে অণিমা?

অণিমা বললে, এখনো আসেনি। তাকে কেন?

জবাব দিলে রূপেন। বললে, নাগরমলের ওখানে তাঁকে নিয়ে আমার যাবার কথা। আসবেন কখন্?

অণিমা মুখ কালো ক'রে বললে, এর মধ্যে সে বন্দোবস্তও হয়েছে নাকি আপনাদের?

হ্যাঁ, আপনার বান্ধবী খুব কাজের লোক, ঠিক পারবেন চাঁদা আদায় ক'রে আনতে।

অণিমা বললে, সে কখন্ আসবে বলতে পারিনে ত। চাঁদা আদায় কি কেবল সেই করতে পারে রূপেনবাবু? আমরা কি নিতান্তই অকেজো?

রূপেন হেসে বললে, তা বলছিনে অণিমা দেবী। তাঁর সঙ্গে য়্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্‌ হয়েছিলো তাই বলছি। আপনি গেলেও হয়। চলুন, আপনিই চলুন। আপনি আর তিনি একই কথা। আসুন, দেরি করবেন না।

প্রভা গিয়ে ঢুকল অফিস-রুমে। রূপেনের সঙ্গে গাড়ি ছিল, অণিমা গিয়ে গাড়িতে উঠ্‌ল। রূপেন ষ্টার্ট্‌ দিলে। গাড়ি ছুট্‌ল।

মিনিট তিনেক পরে ছুটতে ছুটতে মৈত্রেয়ী এসে হাজির। এসেই শুন্‌ল এইমাত্র রূপেন আর অণিমা বেরিয়েছে গাড়ি নিয়ে। স্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত মৈত্রেয়ী দাঁড়াল। পরে মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি ত ঠিক সময়েই এসেছি, ওঁরা আগে থাকতে বেরিয়ে গেলেন কেন প্রভা?

প্রভা বললে, দাদার একটা নেমন্তন্ন আছে ডিনার খাবার, বোধ হয় তাই জন্যে—

তা ছাড়া অণিমারও আগ্রহ, তাই না?—ব'লে মৈত্রেয়ী সশব্দে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে মুখের উপর একখানা কাগজ তুলে নিয়ে মুখের চেহারা গোপন করবার চেষ্টা করলে। চেষ্টা হোলো তার ব্যর্থ, বিক্ষুব্ধ চোখ দুটো তার জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল একটা নিষ্ফল উত্তেজনায়। এমন ভাবে তাকে প্রবঞ্চনা ক'রে রূপেনকে নিয়ে চ'লে যাওয়া অণিমার ভালো হয়নি। কী মনে করেছে সে?

তার সম্বন্ধে রূপেনের পক্ষপাতটুকু অণিমার গায়ে লাগে কেন? তরুণী-সঙ্ঘের মতো প্রতিষ্ঠান যারা গ'ড়ে তুলেছে তারা যদি আজ এত নিচে নামে তবে মানবতার আদর্শ-টা রইল কোথায়?

তাদের অতীত জীবনের বন্ধুত্বটা আজ সুস্পষ্ট মনে পড়ছে। যেখানে তাদের বন্ধুত্বের উপরে কোথাও কালো দাগ নেই। তাদের সবল চরিত্র, স্বচ্ছ ও সুন্দর। তাদের পরস্পরের পরিচয় ছিল মৌখিক বোঝাপড়ায় নয়, পরিচয় ছিল অন্তরে। আজ এই অপ্রত্যাশিত সংঘাতের মধ্যে তার পরীক্ষা সুরু হোলো কেন? কেন আজ এই সন্দেহের মালিন্য স্পর্শ করে সেই বন্ধুত্বকে?

মৈত্রেয়ী নীরবে ব'সে রইল।

নাগরমলের দেখা পাওয়া গেল না। যারা ধনী তারা চাঁদার খাতায় সই করে মুক্ত হস্তে, টাকা দেবার বেলা তাদের দেখা পাওয়া কঠিন। দেউড়ীর দারোয়ান দেয় হাঁকিয়ে।

দেখা যখন পাওয়াই গেল না, তখন আর উপায় কি, রূপেন আর অণিমা আবার উঠ্‌ল গাড়িতে।

ফিরেই যাবেন ত অণিমা দেবী?

অণিমা হেসে বললে, যদি না ফিরি?

না ফিরলে আপনার লাইব্রেরীর কাজ করবে কে?

একদিন না হয় কাজ বন্ধই রইল।

তাহলে কি ইচ্ছে বলুন ?

অণিমা বললে, স্কুলটার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করবার ইচ্ছে আছে।

রূপেন হেসে বললে, আমার সঙ্গে ? আমি ত চল্‌তি পথে, আজ আছি কাল নেই। তার চেয়ে মাঠের ধারে। গিয়ে একটু হেঁটে বেড়াবেন ?

হেঁটে কি হবে। তার চেয়ে গাড়িতে বেড়ানোই ভালো, হোক আপনার একটু পেট্রল্ খরচ।

বেশ ত, হোক না, সে ত আমার সৌভাগ্য।

অনেক পথ ঘাট ঘুরে অনেকক্ষণ পরে গাড়ি এসে পৌঁছল গড়ের মাঠের ধারে রূপেন এবার স্পীড্ কমিয়ে দিলে। আস্তে আস্তে গাড়ি চলছে, দক্ষিণের বাতাস লাগছে। দূরে দূরে ফুলের মালার মতো শহরের আলো দেখা যাচ্ছিল। ঠিক এইটি বোধ হয় চেয়েছিল অণিমা।

রূপেন হেসে বললে, অনেকদিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বল্‌ব ভাবছি অণিমা দেবী।

হঠাৎ রক্তের একটা উচ্ছ্বাস অণিমার মুখের উপর উঠে এলো। জীবনে অনেক বস্তুর সঙ্গেই তার পরিচয় নেই। পাশে ব'সে শরীরটা তার কাঁপছে। বললে, অনেকদিন থেকে ভাবছেন, বলেননি কেন ?

গাড়ির স্পীড্ রূপেন আরো কমিয়ে দিলে। বললে, বলতে সাহস হয়নি।

আজকে হচ্ছে?

আজো না।

অণিমা চুপ ক'রে রইল। রূপেন বললে, আপনি পাছে কিছু মনে করেন এই ছিল ভয়। শুধু মনে করা নয়, হয়ত অফেন্স্ নিতেন। বিলেতে অনেকদিন কাটিয়েছি, কিন্তু সেখানকার মতো সমাজ এখানে নয়। সেখানে অনেক কথাই সহজে সকলকে বলা যায়, কিন্তু এখানে ঠিক সেই কথাগুলোই বিচার ক'রে দেখতে হয়, সেগুলো সঙ্গত কি অসঙ্গত, ভালো কি মন্দ। সেখানে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা সহজ।

তার কারণ?

যে কথায় এখানকার মেয়েরা আর্তনাদ ক'রে ওঠে, সে কথায় ওখানকার মেয়েরা ওঠে হেসে।

আচ্ছা, কি বলছেন বলুন।

বলবার আগে একটু ভরসা দিন্। বলুন, চোখ রাঙাবেন না? মোটর থেকে নেমে পুলিশ ডাকতে যাবেন না?

অণিমা কম্পিতকণ্ঠে বললে, আপনার কথা আমি বুঝতেই পাচ্ছিনে।

বলবার আগে কেমন ক'রে বুঝবেন? ব'লে ফেলে যদি বিপদে পড়ি? আপনার মেজাজ ত আর আমি জানিনে।

অণিমা চিন্তিত হয়ে বললে, এমন কী কথা বলবেন রূপেনবাবু?

সে কথা কুমারী মেয়েকে পথে নিয়ে এসে বলা বোধ হয় উচিত নয়।—রূপেন বললে।

এবার কিন্তু সত্যিই ভয় করছে আপনার কথা শুনতে।

তবে থাক্, বল্‌ব না।

অণিমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললে, আচ্ছা শুন্‌ব, বলুন।

রূপেন হেসে বললে, কথাটা এই যে, আপনার বিয়ের নেমন্তন্ন খাচ্ছি কবে?

একটা গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে অণিমা ফেললে। তার মধ্যে স্বস্তিও ছিল, ব্যর্থতার আভাসও ছিল। হঠাৎ রাগ ক'রে সে বললে, আপনি আমাকে ঠকালেন। এ আপনার রসিকতা নয়, দুষ্টুমি।

গিয়ার হুইলটা ধ'রে রূপেন হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

রাগ ও হাসির ভিতর দিয়ে দুজনের ঘনিষ্ঠতা একটু বেড়ে গেল। অণিমা এবার আসল কথাটা পেড়ে বসল। বললে, সকাল বেলা মৈত্রেয়ী গিয়েছিল আপনার কাছে?

সে ত আপনি জানেন।

শুনে আমি অবাক হয়েছিলুম। আমারো যাবার কথা ছিল। আপনি কি বললেন ওকে?

রূপেন বললে, বলেছি ত অনেক কথা। আপনি কোন্‌টা শুনতে চান্‌?

অণিমা প্রথমটা লজ্জায় চুপ ক'রে গেল; এ কৌতূহলটুকু তার প্রকাশ না করলেই ভালো হোতো। কথাটা তাকে ঘোরাতেই হোলো। বললে, তা নয়। আমাদের ক্লাব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না তাই বলছি।

রূপেন গাড়িতে আবার একটু স্পীড দিলে। তারপর হেসে বললে, না, ক্লাব সম্বন্ধে কথা হয়েছে সামান্যই। পরে তিনি তর্ক তুললেন এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল সাইকোলজি নিয়ে। তারপরেই স্বভাবত যে-আলোচনাটা এসে পড়ে, অর্থাৎ নরনারীর প্রেম— দেখা গেল, আপনার বান্ধবীর পড়াশুনা কম নয়। বেশ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে অণিমা বললে, যাক্‌, আপনার প্রশংসাটুকু তুলে দেওয়া যাবে মৈত্রেয়ীর কানে, খুসিই হবে সে। চলুন, আর নয়, আমার আবার রাত হয়ে যাচ্ছে।—মৈত্রেয়ীর সুখ্যাতিতে কোথায় যেন তার আত্মসম্মান বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। আর যাই হোক সুকুমার সেনের মেয়ে সে, সেও কিছু কম নয়।

রূপেন রসিকতা ক'রে বললে, হাওয়াটা যেন বদলে গেল অণিমা দেবী, মনে হচ্ছে ?

হ্যাঁ, উত্তুরে হাওয়া।

দুজনেই নীরবে রইল। গাড়ি ছুটে চলেছে। রূপেনের কাছে আর কিছুই অস্পষ্ট নেই ; বন্ধুর প্রশংসায় বন্ধু ওঠে ক্ষুব্ধ হয়ে একথা সে আজ ভালো করেই জেনে গেল।

এক সময় সে বললে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার আলাপ অনেক আগেকার, মৈত্রেয়ী দেবীর অনেক আগে।

সে জন্যে আমি বাধিত।

রূপেন তার খোঁচায় হাসলে। বললে, আপনি রাগ করছেন, কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না, হয়ত খোঁজও পাননি, আমি আপনাকে কতখানি সম্মান ক'রে এসেছি মনে মনে।

নিশ্চয় সম্মানের যোগ্য আমি।—অণিমা তীক্ষ্ণ হাসি তার গায়ে ফুটিয়ে বললে, শুনেছি ছেলেরা সকল মেয়ের কাছেই ওই কথা বলে। আপনার এ বাক্যসুধা মৈত্রেয়ীর জন্য তুলে রেখে দেবেন, তার পাত্রটা ভালো।

রূপেন এবার একটু আহত হোলো। বললে, কিন্তু যারা সত্যিই সম্মানের যোগ্য—অনেকেই ত—

অনেকের সঙ্গে আমি পংক্তি ভোজনে বসিনে।

এবারে নিশ্চয় আপনি রাগ করেছেন মনে হচ্ছে।

অণিমা এবার হঠাৎ হাসলে। রূপেনের মুখের দিকে চেয়ে বললে,যারা ছেলেমানুষ আই-সি-এস তারা বোধ হয় সবাই আপনার মতন ?

কেন বলুন ত ?

তাদের বুদ্ধিটা প্রখর কিন্তু জ্ঞান কম।

রূপেন আবার হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

হাওয়ায় উড়ছে চুল, হাওয়ায় উড়ছে মন। কেমন ক'রে না জানি আজকের রাত্রিটি ভালো লাগছে, জীবনের সকল রাত্রির সঙ্গে আজকেরটির ঐক্য নেই। অণিমা চেয়েছিল রূপেনের মুখের দিকে। রাত্রির আলোয় আর ছায়ায় আর মায়ায় সে মুখ বড় ভাল লাগল—তরুণ যুবকের মুখ অপরূপ !

কিয়ৎক্ষণ পরেই গাড়ি এসে দাঁড়াল 'তরুণী-সঙ্ঘে'র দরজায়। বিচ্ছিন্ন হতে আর ইচ্ছা ছিল না, তবু হতে হোলো। কিন্তু একটা আবেদন অণিমা না জানিয়ে থাকতে পারল না। গাড়ী থেকে নেমে মৃদুকাতর কণ্ঠে বললে, একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে রূপেনবাবু।

নিশ্চয় রাখব, বলুন ?

আমাদের কথাবার্ত্তা যা হোলো, মৈত্রেয়ী যেন শুনতে না পায়।

এইমাত্র ? অবশ্য পালন করব আপনার হুকুম !

নমস্কার বিনিময় ক'রে রূপেন গাড়ি হাঁকিয়ে চ'লে গেল।

সে রাত্রে নিদ্রার আভাস দেখা গেল না অণিমার চোখে। মৈত্রেয়ীর গোপন উচ্চাশার খোঁজ পেয়েছে সে। রূপেন কেবল রূপবান নয়, সে আই-সি-এস, এবং আই-সি-এর প্রতি মৈত্রেয়ীর আকর্ষণের কথা কলেজের বন্ধুমহলে কে না জানে! নিজের কথা থাক্, কিন্তু কিছুকাল থেকে সে লক্ষ্য করেছে রূপেন সম্বন্ধে মৈত্রেয়ীর দুর্ব্বলতা।

রাত্রি জেগে সে মৈত্রেয়ীকে একখানা চিঠি লিখলে। সকাল-বেলা পিয়নের হাত দিয়ে পাঠাবে। এমনভাবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া আর সমীচীন নয়। এরপর দেরি হয়ে যাবে।

সকাল বেলা উঠে চিঠি পাঠাবার বদলে সে ডাকতে পাঠাল মৈত্রেয়ীকে। কিন্তু মৈত্রেয়ী এলো না। বলে পাঠাল, তার শরীরটা ভালো নেই। এই প্রথম তার শরীর খারাপ হওয়ার অজুহাত। আজ দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ব্যবধান কতখানি। স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধির বাধল সংঘাত, আজকের এই মনোমালিন্যকে ভব্যতার আবরণ দিয়ে আর ঢেকে রাখা চলে না। মানব চরিত্রের এই শ্রীহীন প্রবৃত্তিটুকু মানুষের সহজাত। আজ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মন নিঃশব্দে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে তারা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয়। ঈর্ষার মধ্যে জন্ম ভালোবাসার এ কথা সাইকোলজি-পড়া ওরা কি বুঝতে পারল?

দিন কয়েক পরে আবার এই গল্পের মোড় ঘুরল। জীবনের দেবতা সোজা পথ দিয়ে হাঁটেন না।

দুই বন্ধুর মধ্যে আজকাল দেখা-শুনো হয় কম। তাদের মনের বিশৃঙ্খলা ফুটে উঠেছে 'তরুণী-সঙ্ঘে'র আপিস ঘরটায়। বর বিদায়ের পর বাসর-ঘরের অবস্থাটা যেমন, সেই দশা। শুধু কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্যের তাগিদ তাদের এই ঘরটায় মাঝে মাঝে টেনে আনে। কথা কয় কম, কাজ হয় সামান্য। কেবল ফর্ম্‌টি বজায় রাখতে পারলেই তাদের ছুটি। একজনের গতিবিধির কৈফিয়ৎ আর এক-জনকে দেবার আজকে আর প্রয়োজন নেই; সেটা ব্যক্তিগত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেদিন দেখা গেল প্রভা এসে বসেছেন অণিমার পাশে, গল্প চল্‌ছে। কোন্ মেয়ে যে কখন কোন্ মেয়ের প্রতি অনুরক্ত বলা কঠিন। প্রত্যেকেই এক একটা দল। এখন বন্ধুত্ব আর সৌহার্দ্যটা বড় নয়, এখন কেবল প্যাক্ট্। লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভিতরে এখন কেবল চুক্তির কানাকানি চলে, কর্ত্তৃপক্ষের গোপন ক্রিয়া-কলাপে মেয়েদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা জটিল হয়ে ওঠে।

প্রভা গল্প করছে কিন্তু অণিমার সেদিকে মনোযোগ নেই, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইছিল দরজার দিকে, এখনই রূপেনের আসবার কথা। সন্ধ্যার সময় তাদের কোথাও কোথাও ডোনেশন্ আদায় করতে বেরুতে হবে।

সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। বাগানের দেবদারু গাছের আগায় পাখীর কাকলী শোনা যাচ্ছে। লাল হয়ে উঠেছে পশ্চিম। প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অণিমা যখন ক্লান্ত, এমন সময় শোনা গেল বাইরে হর্ণএর আওয়াজ।

প্রভা ব'লে উঠ্‌ল, ওই দাদা এসেছে।

অণিমা চকিত হয়ে দরজার দিকে তাকাল, এবং প্রথমেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তা'তে দপ দপ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল তার তুটো চোখ। রূপেনের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যমুখী মৈত্রেয়ী!

চা পানের একটা বিশেষ আয়োজন হয়েছে। পাশের লাইব্রেরী ঘরে ক্লাবের অন্যান্য মেয়েদের আলোপ আলোচনা চলছে। তুজনে এসে এঘরে ঢুক্‌ল। চেয়ার টেনে বসল রূপেন, মৈত্রেয়ী বসল প্রভার ওপাশে। চাকরটা টেব্‌লের উপরে চা এবং জলযোগের আয়োজন করতে লাগল।

রূপেন প্রথমেই অণিমার দিকে চেয়ে বললে, কথা ছিল আপনাকে নিয়ে বেরুবার, কিন্তু আজকে আর সম্ভব হচ্ছে না অণিমা দেবী। পথে আসছিলুম, দেখি আমারই কুটীরের দিকে চলেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। কি আর করি, তুলে নিলুম ওঁকে গাড়িতে। প্রভা, কখন এলি রে?

প্রভা বললে, আমি এসেছি যথাসময়ে। তারপর, কতদূরে তোমরা ঘুরে এলে দাদা? মৈত্রেয়ী, খুব বেড়ালি ত?

মৈত্রেয়ীর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল; অণিমার মুখ হয়ে এলো

শাদা, তার শরীরে বোধ হয় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অলক্ষ্যে সে একবার তাকাল মৈত্রেয়ীর দিকে। মৈত্রেয়ী বললে, তুমি এমনি ক'রে যদি ঠাট্টা করো প্রভাদি তবে আমি উঠে যাবো।

অণিমার আর সহ্য হোলো না। বললে, অনেক ঠাট্টা ভালোও ত লাগে মৈত্রেয়ী!

মৈত্রেয়ী বললে, তোমার লাগতে পারে, আমার নয়!—বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রভা বললে, যাক্ গে বাজে কথা। বলি দাদা, তোমার সুখবরটা আজ দেবো নাকি এদের? এতক্ষণ চেপেছিলুম, আর ভাই আমি পারিনে।

রূপেন একটু লজ্জিত হয়ে বললে, তুই যে বলবি আমি আগেই জানতুম। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না।

প্রভা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললে, দাদা বড় চালাক, কিছুতে ভাঙবে না। তা ব'লে আমি শুনব কেন? সাতাশ তারিখে দাদার যে বিয়ে রে অণিমা!

অকস্মাৎ নীল আকাশ থেকে যেন বাজ পড়ল!—বিয়ে? কা'র সঙ্গে?—অণিমা মৈত্রেয়ী প্রায় একই মুহূর্ত্তে প্রশ্ন করলে। যেন ফাঁসীর হুকুম শুনবে।

প্রভা বললে, জষ্টিস্ মনোহর রায়ের মেয়ের সঙ্গে। আজ পাকা দেখা হয়ে গেছে সকাল-বেলা।

মৈত্রেয়ী বললে, কই, একথাটা ত আপনি বলেননি রূপেনবাবু?

রূপেন বললে, বলতে একটা লজ্জা ছিল মৈত্রেয়ী দেবী।

অণিমা বললে, আমার কাছেও ত বলতে পারতেন? তার চোখে প্রায় অশ্রু এসে পড়ছিল।

মৈত্রেয়ী বসেছিল বজ্রাহত হয়ে। দুইজনেই যেন চূর্ণবিচূর্ণ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অণিমা বললে, ইস্কুলটাকে ভালো ক'রে গড়তে হবে, কি বলিস মৈত্রেয়ী? এদের আগে সুশিক্ষিত ক'রে তোলা দরকার।

মৈত্রেয়ী বললে, ছুটি এসে পড়েছে। এবার পূজোয় কোথায় যাবি রে অণিমা? মেয়েদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে—

অণিমা হেসে বললে, আরে, আমিও তাই ভাবছিলুম। কোথায় যাওয়া যায় বল্ ত? শেষ পর্য্যন্ত পুরী? মনে আছে মৈত্রেয়ী, সেবার কনারককের য়্যাড্ভেঞ্চার?

মৈত্রেয়ী সোৎসাহে বললে, খুব মনে আছে। চল্ ভাই, পুরীই যাওয়া যাক্।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

তৃতীয় প্রকাশ

উৎসর্গ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রীতিভাজনেষু—

তরুণী-সঙ্ঘ